



ମାସିକ

আলোকধারা

ତାସାଓଫ୍ ବିଷୟେ ବହୁମୁଖୀ ଗବେଷଣା ଓ ବିଶ୍ଲେଷଣମୂଳକ ଜାର୍ନାଲ

ରାଜ୍ୟ ନଂ-୨୭୨
୨୪ ତମ ବର୍ଷ
୪୩ ସଂଖ୍ୟା
୨୦୧୮ ଇନ୍‌ଡ୍ରାମୀ



ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଲିମଟେଡ୍, ୧୯୦୨, ଭାରତ ପାତ୍ର, ୦୪
ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଲିମଟେଡ୍, ୧୯୦୨, ଭାରତ ପାତ୍ର, ୦୫



A photograph showing a group of people gathered around a long, patterned cloth spread on the ground. The cloth features intricate designs in shades of orange, yellow, and red. Several individuals are visible, some standing and some sitting, appearing to be engaged in a ceremony or ritual. The setting is outdoors, with a green wall and some trees in the background.



A photograph of a man in a white robe and a red turban sleeping on a bed. He is lying on his side, facing right. The background shows a dark room with a window and some furniture.



A group of people are gathered around a table in a room with green walls. A man in a white shirt is gesturing with his hands while speaking. The room has a window in the background.



A photograph showing a person working on a wooden structure, likely a boat or a porch, under a thatched roof. The person is wearing a white shirt and dark pants, and appears to be focused on their task. The background shows more of the wooden framework and some foliage.



মাসিক আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৪তম বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা

এপ্রিল ২০১৮ ইসায়ী
রজব-শাবান ১৪৩৯ হিজরি
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৪-২৫ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাণ সম্পাদক
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:
লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
US \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

 শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

www.sufimaizbhandari.org.bd

E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচিপত্র

■ সম্পাদকীয়:

■ তাহকীকুল কুরআন : সূরা আল বাকুরাহ শরীফ (পর্ব-৮)

অধ্যক্ষ আলহাজ্ম মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আয়ম শাহআহমদ

৩ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) মহান ১০ই মাঘের

৪ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয় বার্ষিক উরস্ম শরিফের পর তাঁরই আতুল্পুত্র ও স্বনামধন্য

৫ খলিফা হযরত গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারীর (১৮৬৫-

৬ ১৯৩৭) বার্ষিক উরস্ম শরিফ সমাগত। এই মহান দিবস

৭ উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ করি পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও

৮ ভালোবাসায়। তাঁকে নিবেদিত প্রবন্ধের নাম: “উচ্চতর

৯ গবেষণার এক অভিনব অভিধান: মৌনতার আভরণে এক

১০ উত্তাল মহাসম্মুদ্র”।

প্রতিবারের মতো এবারও আলোকধারার শুরু পরিব্র

১১ কুরআনের তাফসীরের মাধ্যমে। স্বনামধন্য আলেমে দীন

১২ জাবেদ বিন আলম

১৩ ১৪ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজীর ‘তাহকীকুল

১৪ আলাকে মুমিনের প্রার্থনা, ইসলামে পূর্ণঙ্গ অন্তর্ভুক্তি, মহানবীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, জিহাদের ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা

১৫ ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

অধ্যাপক জহরুল আলম এর ধারাবাহিক প্রতিবেদন ‘গাউসুল

১৬ আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়’।

এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ফটকছড়ি ও মাইজভাণ্ডার

১৭ নামকরণের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

জাবেদ বিন আলম এর ধারাবাহিক প্রতিবেদন ‘তাওহীদের

১৮ সূর্য’। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নবুয়তের দুটি ধারা: (১)

১৯ ৩২ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (২) প্রেম পদ্ধতি।

২০ ৩৩ মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আয়ম শাহআহমদ

২১ ৩৫ মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর “মহাসম্মুদ্রুল্লাহী মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা”র তাত্ত্বিক ভিত্তির লিখিত রূপ প্রণীত ও প্রকাশিত হয়

২২ ৩৬ তদীয় গোত্র, অছি (vicegerent) এবং মনোনীত

২৩ ৩৭ পাঠক প্রতিক্রিয়া: ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ বিংশ শতাব্দীর একটি সাজানানশীন সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর

২৪ ৩৮ গ্রন্থ প্রতিক্রিয়া: ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থে। এই গ্রন্থের উপর নিরীড়

২৫ ৩৯ তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন স্বনামধন্য

২৬ ৪০ সাংবাদিক ও কলামিস্ট মোঃ মাহবুব-উল-আলম। তাঁর

২৭ ৪১ প্রবন্ধের নাম: “বিংশ শতাব্দী-উত্তর আধুনিক কল্যাণ চেতনায়

২৮ ৪২ বাজ্যে-‘বেলায়তে মোত্লাকা’”।

২৯ ৪৩ পরীক্ষা পর্বের ফসল হিসেবে এ সংখ্যা থেকে কয়েকটি নতুন

৩০ ৪৪ অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে। যেমন: (১) সুফি সাহিত্য (২)

মাসিক আলোকধারা

সম্পাদকীয়

১০ই মাঘ আর ২২শে চৈত্র

১ আশেকানে ঈদ করে ভাই, আশেকানে ঈদ করে।

২ -মহি আল ভাণ্ডারী

৩ অধ্যক্ষ আলহাজ্ম মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আয়ম শাহআহমদ

৪ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) মহান ১০ই মাঘের

৫ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয় বার্ষিক উরস্ম শরিফের পর তাঁরই আতুল্পুত্র ও স্বনামধন্য

৬ খলিফা হযরত গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারীর (১৮৬৫-

৭ ১৯৩৭) বার্ষিক উরস্ম শরিফ সমাগত। এই মহান দিবস

৮ উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ করি পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও

৯ ভালোবাসায়। তাঁকে নিবেদিত প্রবন্ধের নাম: “উচ্চতর

১০ গবেষণার এক অভিনব অভিধান: মৌনতার আভরণে এক

১১ উত্তাল মহাসম্মুদ্র”।

প্রতিবারের মতো এবারও আলোকধারার শুরু পরিব্র

১২ কুরআনের তাফসীরের মাধ্যমে। স্বনামধন্য আলেমে দীন

১৩ জাবেদ বিন আলম

১৪ ১৪ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজীর ‘তাহকীকুল

১৫ আলাকে মুমিনের প্রার্থনা, ইসলামে পূর্ণঙ্গ অন্তর্ভুক্তি, মহানবীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, জিহাদের ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা

১৬ ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

অধ্যাপক জহরুল আলম এর ধারাবাহিক প্রতিবেদন ‘গাউসুল

১৭ আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়’।

এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ফটকছড়ি ও মাইজভাণ্ডার

১৮ নামকরণের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

জাবেদ বিন আলম এর ধারাবাহিক প্রতিবেদন ‘তাওহীদের

১৯ সূর্য’। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নবুয়তের দুটি ধারা: (১)

২০ ৩২ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (২) প্রেম পদ্ধতি।

২১ ৩৩ মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আয়ম শাহআহমদ

২২ ৩৫ মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর “মহাসম্মুদ্রুল্লাহী মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা”র তাত্ত্বিক ভিত্তির লিখিত রূপ প্রণীত ও প্রকাশিত হয়

২৩ ৩৬ তদীয় গোত্র, অছি (vicegerent) এবং মনোনীত

২৪ ৩৭ পাঠক প্রতিক্রিয়া: ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ বিংশ শতাব্দীর একটি সাজানানশীন সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর

২৫ ৩৮ গ্রন্থ প্রতিক্রিয়া: ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থে। এই গ্রন্থের উপর নিরীড়

২৬ ৩৯ তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন স্বনামধন্য

২৭ ৪০ সাংবাদিক ও কলামিস্ট মোঃ মাহবুব-উল-আলম। তাঁর

২৮ ৪১ প্রবন্ধের নাম: “বিংশ শতাব্দী-উত্তর আধুনিক কল্যাণ চেতনায়

২৯ ৪২ বাজ্যে-‘বেলায়তে মোত্লাকা’”।

৩০ ৪৩ পরীক্ষা পর্বের ফসল হিসেবে এ সংখ্যা থেকে কয়েকটি নতুন

৩১ ৪৪ অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে। যেমন: (১) সুফি সাহিত্য (২)

মহিলা মহল (৩) প্রশ্নোত্তর পর্ব (৪) মাইজভাণ্ডারী গান

ইত্যাদি।

‘সুফি সাহিত্য’ অধ্যায়ে এবারের নির্বাচিত সুফি ব্যক্তি মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমি। সুফিবাদকে একাত্ত জীবন ঘনিষ্ঠাতায় আলোচনা পর্যালোচনার পাশাপাশি বিগত, সমকালীন এবং আগামী দিনের সুফিতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতায় তাঁর অনন্যসাধারণ লেখনী ও পূর্বীপর এর প্রভাব বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে এ পর্বে।

‘মহিলা মহল’ পর্বে এবারের নির্বাচিত বিষয়: ‘সৃষ্টির সর্বপ্রথম মানবী হযরত মা হাওয়া (আঃ)’। মহান সৃষ্টিকর্তার ‘কুন ফায়ারুন’ এর বিহিতিকাশ হিসেবে হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর থেকে মা হাওয়ার সৃষ্টি রহস্য বিষয়ক বর্ণনার মৌলিক তথ্য সৃষ্টিই হলো পবিত্র কুরআন ও হাদিস। এরই আলোকে এ অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে।

‘প্রশ্নোত্তর পর্ব’ এবারের বিষয়: ‘প্রশ্নোত্তরে মাইজভাণ্ডারী শরীফ’। মাইজভাণ্ডারী দরবার শরীফ বিষয়ক নানা জানা-অজানা বিষয় বস্তিনিষ্ঠাতাবে অবহিত হওয়া যাবে এ পর্বের আলোচনায়।

‘মাইজভাণ্ডারী গান’ অধ্যায়ে থাকবে এ গানের আদি রচয়িতা হযরত আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরীর সংক্ষিপ্ত পরিচিত এবং সামাজিক মাহফিলের প্রায় অপরিহার্য একটি গান “দমে দমে জপে মন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। উল্লেখ্য, আধ্যাত্মিক মহিমায় খন্দ এ গানে ব্যবহৃত সুফিতাত্ত্বিক তথ্য তাসাওফ জগতের শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলো সহজে বোধগম্যতার জন্য উল্লেখযোগ্য টীকাভাষ্য সংযোজন সম্মানিত পাঠক সমাজের কাছে এ গানের আবেদন আরো বেশী হাদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

পরীক্ষা পর্ব হিসেবে আর একটি বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। তা হলো ‘গ্রন্থ পর্যালোচনা বা পাঠক প্রতিক্রিয়া’। এ ধারায় এবারের বিষয় হলো মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তিমূলক গ্রন্থ ‘বেলায়তে মোত্লাকা’। বিংশ শতাব্দীতে রচিত (১৯০৬) এ গ্রন্থ বিষয়ে একবিংশ শতাব্দীর (২০১৮) একজন গবেষকের অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ এতে ফুটে উঠেছে।

প্রচন্দের ভিতরের পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে মন্ত্রিল ও দরবার সংশ্লিষ্ট পুরনো দিনের ছবি- ‘যে ছবি কথা বলে’। মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমির উচ্চ স্তরের সুফিতাত্ত্বিক উপদেশগুলো গল্পের আদলে উপস্থাপনার গুণে তা বৃহত্তর পাঠক সমাজের অনেক কাছাকাছি আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১৪২৫ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আলোকধারার সম্মানিত পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

তাত্কীরুল কুরআন

সূরা আল-বাকুরা শরীফ (পর্ব-৯)

• অধ্যক্ষ আলহাজ্র মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী •

[বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যক্ষ আলহাজ্র মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রণীত তাফসীর-এ-সূরা ফাতিহা শরীফ মাসিক আলোকধারায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পর্বে পর্বে ক্রমশঃ সূরা আল বাকুরা শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হচ্ছে।]

আলহাম্মদু ওয়াস্সানাউ ওয়াশ্শুকুর লিল্লাহিল্লাজী
নাওয়ারানা বিনুরিল ইমান, ওয়া আফ্দালুস্সালাতু ওয়া
আয্কাস্সালামু ওয়া আহসানুভাত্তাহাতু আলা মান খাস্সাহ
বিলু কুরআন, আল্লাজী লাইছা লাহ নজীরুন ওয়া লা
মিচালুন ওয়া লা চান। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহলি
বাইতিহী ওয়া আস্থাবিহিল্লাজীনা কুমু বিলু ফুরক্তান, ওয়া
আলা আত্বাযুল্লাজীনা তাবিযুহুম বিলু ইহসান, বিলু খসুসি
আলা গাউসুল আযম আশ্শাহ আস্সুকী আস্সেয়দ
আহমদ উল্লাহু আল্মাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আযম বিলু
বিরাসত বাবাভাণ্ডারী আশ্শাহ আস্সুকী আস্সেয়দ
গোলামুর রহমান, ওয়া আলা আওলাদহিল্লাম ওয়া আহলি
তুরীকুত্তাহীমাল্লাজীনা সাবাকুনা বিলু ইমান। আম্মাবাদ.....
পূর্ব প্রকাশের পর

❖ মু'মিনদের প্রার্থনার ধরণ: ২০১ নং আয়াতের প্রারম্ভে
একটি উত্তম দোয়া মুমিনদের প্রার্থনা রূপে স্বীকৃতি দিয়ে
তা উত্তম দোয়া বলে প্রশংসন করেছেন স্বয়ং আল্লাহু
জাল্লা মাজডুহ। বলা হয়েছে 'রাবকানা আতিনা ফিদ্দুইয়া
হাছানাতো ওয়া ফিল আখিরাতি হাছানাতো ওয়াকুনা
আয়াবান্নার' অর্থাৎ- তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে
পরওয়ার দিগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণদান
কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং
আমাদেরকে দোয়েরে আগুন থেকে রক্ষা কর।' এটি
মু'মিনদের জন্য খুবই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ দোয়া। ২০০ নং
আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- 'তারপর অনেকে তো
বলে যে, হে পরওয়ার দিগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে
দান কর। অথচ তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই।
উক্ত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে,
প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক
শ্রেণী হচ্ছে কাফির ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের
প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে
মু'মিন। যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা
পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের কল্যাণও

কামনা করে।

❖ ইসলামে পূর্ণাঙ্গ অস্তুর্ভুক্তি: ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহু হৃদয়ে স্থান দেয়া, তাদের কাছে আল্লাজীনা আমান্দুখুলু থেকে কোনো উপর্যুক্ত পাঠ করা, ফিচ্ছিল্লমি কাফকাহ' ওয়ালা তাত্ত্বাবিয়ু খুত্তওয়াতিশ তাদেরকে শারীরিক-মানসিক কিংবা আর্থিক সাহায্য-শাইতান।' অর্থাৎ- হে ইমানদারগণ! তোমরা সহযোগিতা প্রদান, এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অস্তুর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং উক্ত আয়াতে আল্লাহপাক প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন।

উদাহরণ স্বরূপ নামায বর্জন করা যেমন শয়তানের পদাংক

এ পবিত্র আয়াতের তিন ধরণের বিশ্লেষণ হতে পারে। (১) অনুসরণ, তেমনি বাতিল আল্লাদা সম্পন্ন কোনো নামাযে তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অস্তুর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ ইমামতি করতে দেয়াটাও শয়তানের পদাংক অনুসরণ। তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক, সবকিছুই যেন ছদকা-খয়রাত না করা যেমন শয়তানের পদাংক অনুসরণ, ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে তেমনি বাতিল ফিরকার লোকদের যে কোনো কর্মে যে কোনো যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ধরনের অর্থ অনুদানও শয়তানের পদাংক অনুসরণ। যেমন ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওয়া তায়াওয়ানু আলাল বিরারি ওয়াত মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের তাকওয়া ওয়ালা তায়াওয়ানু আলাল ইহমি ওয়াল উদওয়ান' অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে; কিন্তু হস্ত-পদাদি, অঙ্গ-প্রতঙ্গের (সূরা মায়িদাহ : ২)। অর্থাৎ তোমরা সৎ ও খোদাইরূতার ত্রিয়কলাপ তার বিরংবে। (২) তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের কাজে প্রস্তরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমা লংঘনে অস্তুর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ- এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের একে অপরকে সাহায্য করো না।

কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি প্রিয়নবী (দ.)'র গাধার প্রতিও কুম্ভন্ত্য অবাঙ্গলীয়: মহান নবী করতে থাকলে। তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত সাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি তিলমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। (৩) এতে এ অশোভন আচরণও ধর্মচ্যুতির কারণ। উদাহরণ স্বরূপ এ অর্থও বিদ্যমান যে, তোমরা শুধু যুথে ইমান এনেছ বলে; হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু কিন্তু অন্তের ঈমান আল্লাদা পোষণে বাতিল ফিরকার অনুসরণ তা'য়ালা আনহ হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী করীম করলে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আল্লাদা বা ধর্মত সাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো অন্তের দৃঢ়মূল করতে সন্দেহের আশ্রয় নিলে; এমতাবস্থায় আপনি যদি আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ের কাছে একটু যেতেন সেই দৃশ্যতঃ ঈমান আনার কোন মূল্য নাই, সুন্নী আল্লাদা (তবে তালো হতো)। নবী করীম সাল্লাহু তা'য়ালা সমূহ অকপটে মন-মস্তিষ্কে ধারণ পূর্বক পরিপূর্ণভাবে ইসলামে আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যাওয়ার জন্য গাধায় প্রবেশ কর। কেননা একমাত্র সুন্নী আল্লাদাই একজন প্রকৃত (সম্মানার্থে দীর্ঘকর্ণ বিশিষ্ট) আরোহন করলেন এবং মু'মিন-মুসলমান এবং কপট-মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য সূচিত মুসলিমগণ তাঁর সঙ্গে হেঁটে চলল। আর সে পথ ছিল করতে সক্ষম। সুতরাং যে পর্যন্ত ইসলামের সমস্ত বিধি- কংক্রিময়। নবী করীম সাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে পৌছুলে সে বলল, সর! আমার প্রকৃত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেনা। সম্মুখ থেকে। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আয়াতের দ্বিতীয় অংশ যেখানে শয়তানের পদাংক অনুসরণে তাদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বলল- আল্লাহর কসম!

বারগ করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণে বলা যায়, যারা শয়তানের মতো বাহ্যিক চাকচিক দিয়ে মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে অস্তরের বাতিল আল্লাদা প্রকাশ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এমনকি সুযোগ পেলে রাস্তীয় ক্ষমতাও দখল করতে সচেষ্ট। তাদেরকে অনুসরণ, তাদের আল্লাদা বা ধর্মত গ্রহণ, তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান, তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে ইমাম বানানো, তাদের পেছনে নামায পড়া, তাদেরকে নেতৃত্ব আসনে বসানো, তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন, তাদেরকে বলেন- মোসাদ্দদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহ বসার এবং হাদীস বর্ণনার পূর্বে আমি তার থেকে এ হাদিস হাসিল করেছি। (সুত্রঃ বুখারী শরীফ- কিতাবুস সুলহি, হাদিস নং ২৫১২, বঙ্গনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। প্রতীয়মান হয়, যেক্ষেত্রে রাসূলে পাকের (পবিত্র) গাধাকে তিরকার করাটা অসমীচীন সাব্যস্ত হয়েছে, সেখানে স্বয়ং রাসূলে পাকের প্রতি কোনোরূপ অশোভনীয় আচরণ কী ধর্মচ্যুতির কারণ নয়?

❖ বিশেষ জ্ঞাতব্য: উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী বিধানের অস্তুর্ভুক্ত বলে মনে করে না, সুন্নী মতাদর্শ-সুন্নী আল্লাদা বিশ্বাসকে ইসলামের পূর্বশর্ত এবং প্রতিয় নবী করীম সাল্লাহু তা'য়ালা ও ভক্তি-শুদ্ধাকে ইমানের পূর্বশর্ত বলে বিশ্বাস করেনা বা মেনে নেয়না তাদের ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতখনা কঠিন সর্তর্কবাণী হিসেবে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত দ্বিনার বেশভূয়া-ধারীদের মধ্যে ক্রটি-বিচুতি অধিকাংশভাবে পরিলক্ষিত হয়। এরা ধর্মীয় নীতি-বিধান এর প্রতি যেমন ঝুঁকেপ করেনা, তেমনি প্রকৃত ঈমান সুন্নী আল্লাদার প্রতিও প্রিয় নবী নয়। এসব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ বা অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। তাই তারা পথভ্রষ্ট ও বাতিল দলভূক্ত। আল্লাহু পাক তার হাবীবের উসীলায় সবাইকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাতের আল্লাদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার তত্ত্বক দান করুণ। এতদ্বিন্ম সুন্নী মতাদর্শী কোন রাজনৈতিক দল পাওয়া গেলে রাস্তীয় পর্যায়ে ঐ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে তাদেরকে রাস্তীয় ক্ষমতায় আনার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অপরিহার্য কর্তব্য। এ বিষয়টিও অত্র আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাবধারায় বিদ্যমান।

- ❖ **সৃষ্টির আদিতে মানব ছিল এক জাতি:** ২১৩ নং আয়াতের প্রারম্ভে বলা হয়েছে- ‘কানান্নাছু উমাত্তাও ওয়াহিদাতান’ অর্থাৎ- ‘সকল মানুষ একই জাতিসন্তান অস্তিত্ব ছিল।’ এতে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যাচ্ছে যে, সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদে স্থৃত করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহ্বান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে। এ একক জাতীয়তার ভিত্তি ছিল আল্লাহর ওয়াহিদানিয়াত বা একত্ববাদ। পরবর্তীতে মতাদর্শ, আকারেদ ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্যের কারণে মানুষ সঠিক আঙুলী থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ইমানদারদের পক্ষে তাঁদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফিরেরা তাঁদের পূর্ব পুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মু’মিন, সুন্নী মুসলিম ও ওলামা-মশায়েখের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা এবং মুক্তিধ্বান্ত মনোমুক্তির ওয়াজ-নসীহত এবং ন্যাতা-অদ্বার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মত আহলে সুন্নাতের প্রতি আহ্বান করতে থাকা। এ কথা বলা যে, কুরুরী ও মুনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অস্তিত্ব হয়ে যাও। বাতিল ফিরকা বা আন্তদলের দলমত ত্যাগ করে ইসলামের সঠিক ক্রপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আঙুলী পোষণ কর, কেননা সেটাই হলো নবী করীম ঘোষিত একমাত্র নাজী ফিরকা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল।
- ❖ **কষ্ট অনুগ্রামে জান্নাতের স্তর ধার্য হয়:** পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে প্রতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশ্ত লাভ করতে পারবে না। অথবা পবিত্র কুরআন-হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার বদৌলতে জান্নাত লাভ করবে, এতে কোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজন হবেনা। কারণ কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্থীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আঙুলীকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মু’মিনেই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা ভেদে যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। হাদীসে পাকে এসেছে, রাসূলে পাকের ঘোষণা-‘আশাদুল্লাসি বালাআল আমিয়া’ অর্থাৎ ‘সবচাইতে

- ❖ **অধিক বালা-মুসীবতে প্রতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ।** তাঁরপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।
- ❖ **কুরআনে কারীমে প্রশ়্নাত্বে:** শরীয়তের যেসব হৃকুম-আহকাম সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। সমগ্র কুরআনে এমনভাবে প্রশ্নাত্বের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় ১৭টি স্থানে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ৭টি সূরা বাকুরায়, ১টি সূরা মায়িদায়, ১টি সূরা আনফালে। এ নটি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ’রাফে ২টি এবং সূরা বৃষ্ণি ইসরাইল, সূরা কাহাফ, সূরা তাহা ও সূরা নাহেতাতে ১টি করে ৬টি স্থানে কাফিরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল যার উত্তর কুরআনে করীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে।
- ❖ **সাহবাগণ উত্তম দল:** রাইসুল মুফাস্সিরীন বা কুরআন বিশ্লেষকবৃন্দের স্বার্থাত হয়েরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুসান রাবিদ্বাল্লাহ তাঁয়ালা আনন্দ বলেছেন, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহবাগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি, ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরোগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাঁদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সঙ্গেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট ১৩টি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কুরআনে করীমে দেয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। (সূত্র: কুরুতুবী)
- ❖ **মওদুদির আন্ত মতবাদ:** জামায়াতে ইসলামী নামে একটি নামধারী ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের পাঞ্জাব এর অধিবাসী সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী তার লিখিত পুস্তক গুলোতে সাহাবায়ে কেরামের তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে যে, এক সমালোচনা করে লিখেছে (ক) ‘রাসূলে খোদা ব্যতীত ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অন্য কেউ চাই তিনি নবী হউন অথবা সাহাবা হউন জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজেস সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না।’ (খ) ‘রাসূলে খোদা করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে ব্যতীত অন্য কাকেও সমালোচনার উর্ধ্বে স্বীকার করা বল্লো, জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি যাবে না।’ এসব উক্তি পূর্বে তিনি সাহাবা, তাবেয়ীন, ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খিদমত তাবে’ তাবেয়ীন, আইম্যায়ে মুজতাহেদীন, মুহাদ্দেসীনেরেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর। এতেও বুবা যায় যে, কেরাম ইত্যাদি কেউ হকু বা সত্যের মাপকাঠী নন। ফরজে কিফায়া (যথেষ্ট হওয়া ধরণের ফরজ)। অধিকাংশ তাঁদের কারো মতাদর্শ অনুসরণ যোগ্য নয়। অবাধে ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ও হাদিস বেতাগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত তাঁদের সমালোচনা করা যাবে। (গ) ওলামা-মশায়েখে ও হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরজে মুক্তি সাহেবগণ সকলেই গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট। তাঁরা কিফায়া।
- ❖ **সবাই জাহিলদের মতই ইসলামের হাকুমুকুত সম্পর্কে*** জিহাদে আকবর: তাসাওউফের পরিভাষায় মাঠে ময়দানে অঙ্গ। (সূত্র: দস্তুর জামায়াত, পৃঃ২৪, তাফহীমাত- ১ম কাফির মুশরিকদের সাথে তরবারী, নেজা, বল্লম, তীরসহ খড়, পৃঃ৩৬, সিয়াসী কশমকশ- ৩য় খড়, পৃঃ৭৭, বিভিন্ন সমরাঙ্গ নিয়ে ধর্মযুদ্ধে লিঙ্গ হওয়া বা জিহাদ করাকে তরজুমানুল কুরআন দ্রষ্টব্য) প্রকৃত পক্ষে তিনি এ ধরণের জিহাদে আসগর বা ক্ষুদ্রতম জিহাদ আখ্যায়িত করা হয়। আর ইসলাম বিরোধী ফতোয়া প্রদান করে নিজেই পথভ্রষ্ট আপন নফস বা কু-রিপুর সাথে যুদ্ধ করা, আত্ম সংগ্রাম করাকে জিহাদে আকবর বা বৃহত্তম জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) বলা

হয়। হয়েরত ওমর ফারুক রাবিদ্বাল্লাহ তাঁয়ালা আনন্দ যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন ‘রাজায়ান মিন জিহাদিল আসগরে ইলাল জিহাদিল আকবর’ অর্থাৎ- আমরা অবশ্যই ক্ষুদ্রতম জিহাদ থেকে বৃহত্তম জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। উক্ত হাদিস শরীফকে সূফী স্মার্ট জ্ঞান তাপস হয়েরত জালালুদ্দীন রূমী রহমাতুল্লাহি তাঁয়ালা আলাইহি তার মসনবী শরীফে ফার্সী ছন্দে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে,

ই জাম্মা আদ্দের জিহাদে আকবরিম +

কুদ রাজায়ান মিন জিহাদিল আসগরীম ॥

অর্থাৎ- বর্তমান যুগে আমরা জিহাদে আকবর বা বৃহত্তম ধর্ম যুদ্ধে লিঙ্গ রয়েছি, কেননা, অবশ্যই আমরা জিহাদে আসগরে বা ক্ষুদ্রতম জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান কালে সকলকে আবশ্যকীয়ভাবে আত্মগুরির সংগ্রাম জিহাদে আকবরে লিঙ্গ থাকতে হবে। যা আওলিয়া-এ-কেরামের তাসাওউফ চার অন্যতম বাহন। আল্লাহ তাঁয়ালার জিকিরের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়।

❖ **জিহাদের অপব্যাখ্যা নিরসন:** কোন কোন মহল জিহাদের অপব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি গোষ্ঠীর জন্য দিয়েছে। যারা মহাপাপ কর্ম নরহত্যার পথ বেছে নিয়ে আল্লাহর সম্মতি অর্জন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কার্যকলাপ না ইসলাম সমর্থন করে, না তাতে আল্লাহ সম্মত হন, বরং তাঁদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ নারকীয় শাস্তি। কেননা, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকের এক আয়তে বলেন- ‘যে ব্যক্তি কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম’ (সূরা নিসা : ৯৩)। যে জাতিতে আসাসংগ্রামের মাধ্যমে আত্মগুরির প্রবণতা যত বেশী বৃদ্ধি পাবে, সে জাতি তত বেশী শাস্তিতে থাকবে। কেননা, আত্মকলহ-দন্দ-সংঘাত নিরসনে আত্মগুরির জন্য আসাসংগ্রামের বিকল্প নেই। তাই জিহাদের নামে নরহত্যা নয়; দুনিয়া-আখিরাতের অবারিত সুখ-শাস্তি অর্জনে চাই আত্মগুরির জন্য আসাসংগ্রাম। হাদীসে পাকে প্রজাবান বিখ্যাত সাহাবী হয়েরত আবু হুরায়রা রাবিদ্বাল্লাহ তাঁয়ালা আনন্দ হতে বর্ণিত, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ‘যে ব্যক্তির ক্ষতি হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে যাবে না।’ (মুসলিম শরীফ : ১ম খড় : ৭৮)। অত্ব হাদিস শরীফে প্রতিবেশী বলতে কোনো বিশেষ ধর্মালম্বীর কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিবেশী যেকোনো ধর্ম-বর্ণ গোত্রের লোকই হোক না কেন, তাঁর কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা হলো; এ ক্ষতিকারী ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে না। এখানে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক নিরাপর্ণ চির ফুটে উঠেছে। (চলবে)

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়

• জহুর-উল-আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি, পরগণাতে মাইজভাণ্ডারী:
হ্যারত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহঃ) ফসুল হিকম কিতাবে বর্ণিত তথ্যপঞ্জীর সময়কালে বাংলা অঞ্চলে ভূক্তি-আফগান শাসকদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মুসলিম ন্যূনতর সমুদ্র উপকূলের সীতাকুণ্ড এলাকার পশ্চিম এবং দক্ষিণ হাটহাজারী এলাকা পর্যন্ত তাঁদের প্রশাসনের বিস্তৃত ঘটায়। চট্টগ্রাম শহর থেকে ঢাকা অভিযুক্তি গ্রান্ট ট্রাক্স রোড, হাটহাজারীর নশরত বাদশাহৰ দীঘি (বড় দীঘি), সীতাকুণ্ড-হাটহাজারীর সীমানা নির্ধারিত পাহাড়ের পাদদেশের বাদশাহী রাস্তা-প্রত্ন অসংখ্য চিহ্ন চট্টগ্রামের লোকালয়ে স্থৃত হয়ে আছে। অঙ্গ-গাউসুল আয়ম হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং) তাঁর বেলায়তে মোত্লাকা গ্রান্টে ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্র বংশীয় দেবগণ চট্টগ্রামে স্থানীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে এ বংশের ন্যূনতর ভূমি দান করেছেন বলেও তিনি তথ্য দিয়েছেন। মূলত: শায়খুল আকবর (রহঃ) এ সময়ে ‘খাতেমুল অলদ’ সম্পর্কে ফসুল হিকম কিতাবে ভবিষ্যত বাণী করেছেন বলে ধারণা করা হয়।

‘খাতেমুল অলদ’ তথ্য আখেরী নবীর (দঃ) ওয়ারিশ হিসেবে আখের জমানার প্রবর্তকের জন্মান্তর ফটিকছড়ি বলে তথ্য ভিত্তিক উপস্থাপনা ইতোমধ্যে বিভিন্ন গবেষণা পত্রে বিবৃত হয়েছে। ফটিকছড়ির উত্তর পূর্বদিকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষত খাগড়াছড়ি এবং রাঙামাটিতে এখনো দুটি পাহাড়ি সন্নাতন সামন্ত রাজবংশের নামান্তর উপস্থিতি বিদ্যমান আছে। একসময় ফটিকছড়ি উপর্যুক্ত পাহাড়ি রাজার প্রভাবাধীন ছিল। এখানে তখন মগী সন গঁণনা করা হতো এবং দলিল-দস্তাবেজে মগী সনের দিন তারিখ উল্লেখ থাকত। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহ তখন তাদের নিজস্ব ভাষায় চট্টগ্রামকে চাতংগং বলত। মফুতলী গ্রামের পাহাড়ি এলাকার স্কুল শিক্ষক এবং পাহাড়ি সামন্ত সমাজ কাঠমোর হেডম্যান বাবু ছাদক কুমার দোভাষী থেকে জাত হয়ে বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের প্রণেতা হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং) চাতংগং এর অনুবাদ হিসেবে চট্টগ্রাম নামের বাংলাভাষিক শব্দার্থ করেন ‘শাস্তির সেরা’। চাতং শব্দের অর্থ শাস্তি, গং শব্দের অর্থ মাথা বা শীর্ষস্থান। এ ব্যাখ্যায় চট্টগ্রাম এর মর্মার্থ দাঁড়ায় শাস্তি-সম্পূর্ণতর গর্বিত স্থান বা এলাকা।

‘খাতেমুল অলদ’ এর জন্মান্তর ফটিকছড়ি উপজেলার মাইজভাণ্ডার গ্রামে। ফটিকছড়ি নামটি স্থানীয় পাহাড়ি

অস্ত্র-রসদ সরবরাহখনা। ভৌগলিকভাবে ফটিকছড়ির মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ায় এই সরবরাহ কেন্দ্রের নাম হয় মাইজভাণ্ডার। পৃথিবীর যে কোন এলাকায় ভাণ্ডারখনাকে সব সময় নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তোলা হয়। কোলাহল, হিংসা-খাগড়াছড়িতে মানিকছড়ি, হিমছড়ি, তৰলছড়িসহ ‘ছড়ি’ অগণিত মহামূল্যের সম্পদ ও স্মৃতির নিরাপদ ভাণ্ডার। সংযুক্ত অসংখ্য নাম লক্ষ্য করা যায়। ফটিকছড়ি উপজেলার মাইজভাণ্ডার গ্রামের উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি লোকালয়ে দূর অতীত আয়তন বাংলাদেশের ফেনী জেলার সমান। ফটিকছড়ি জুড়ে থেকে অনেক অলি বুজুর্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অসংখ্য পাহাড়, খাল-বিল, টিলা, জলাভূমির অবস্থান দেখা ফটিকছড়ির পাহাড়ি এলাকায় তেমন লোকবসতি ছিল না। যায়। অর্থাৎ এলাকাটি বিশাল পাহাড়ি ভূখণ্ডের পাদদেশ ফলে নীরবে-নিভৃতে কোন্দল-কোলাহল মুক্ত এলাকায় হিসেবে ভৌগলিকভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ফটিকছড়ির গোপনীয়ভাবে সাধানার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অনেক গ্রাম-মহল্লা খাল বিলের নাম পাহাড়ি শব্দরাজির সঙ্গে লক্ষ্যে অনেক সাধক পুরুষ পাহাড়ে-জঙ্গলে কঠিন রেয়াজত সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, মাইজভাণ্ডার গ্রামের সন্নিকটে ধুর-খাল, সম্পন্ন করেছেন। বর্তমান সময়ে এ সকল সাধানা ক্ষেত্র ঘৰে লেলাং, দমদমা, হালদা, খিরাম প্রভৃতি নাম লক্ষ্য করা যায়। গড়ে উঠেছে অলি-দরবেশদের মাজার। উল্লেখ করা সঙ্গত ফটিকছড়িতে পাইন্দং, হারয়লছড়ি, বৃন্দাবনহাট, ছিলোনিয়া, যে, এ সকল অলি-দরবেশদের প্রায় সকলেই ‘খাতেমুল রোসাখগিরি, এধরনের বহু নাম পরিলক্ষিত হয়। এ সকল অলদের’ আবির্ভাবের পূর্বে-বিচৰণ করেছেন। জনবিছিন্ন নামের সঙ্গে মগী-শাসনের সংযুক্তি আছে বলে সাধানা জগতে একান্তভাবে নিমগ্ন থাকার কারণে এ সকল ইতিহাসবিদদের ধারণা। ফটিকছড়ি নামকরণ ফটিকছড়ি ছড়া অলি-দরবেশদের পরিচিতি এবং সময়কাল নির্ণয় করা (খাল) নাম থেকে সৃষ্টি। এ ছড়ার উৎপত্তিস্থল খাগড়াছড়ি অনেকাংশে অসম্ভব। মূলতঃ ‘খাতেমুল অলদের’ জন্মস্থানকে জেলায়। এটি মূলতঃ পাহাড়ি জল প্রবাহের ছড়া। এটি কেন্দ্র করে ঐশ্বী জলসা ঘর নির্মাণের আয়োজক হিসেবে এ হালদার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কর্ণফুলীর স্নোতাধারায় ধরনের অসংখ্য অলি-আল্লাহ ফটিকছড়ির পাহাড়ে জঙ্গলে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। হালদা, ধুরং, লেলাং, বোয়ালিয়া, বিচৰণ করেছেন।

বিনাজুড়ি, ফটিকছড়িসহ অসংখ্য পাহাড়ি জলাধারের কারণে বাংলা অঞ্চলে চীনা বংশের তুর্কি-ন্যূনতর শাসনের ঘটনাপঞ্জী এটি জলমগ্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। বর্ষাকালে নদী, ইতিহাসের স্থীরুক্ত বিষয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও বাংলা খাল এবং ছড়ার প্রবল জল প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিত পাহাড়ি অঞ্চলের গ্রাম-গঞ্জের অনেক মসজিদে তুরকের সুলতান পলিমাটির স্তর জমে ক্রমশঃ ভৱাট হয়ে অত্র অঞ্চল উর্বর আবদুল হামিদ খানের হুকুমতের নামে খোঁবা পাঠ করা এলাকায় পরিগণিত হতে থাকে। জমিতে উর্বরতা সৃষ্টির হতো। অর্থাৎ এ অঞ্চল মঙ্গেলিয়ান বংশোদ্ধৃত তুর্কীদের কারণে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খালে-বিলে নিয়ন্ত্রণে ছিল বিদ্যায় সুনীর্য সময়ব্যাপি তুর্কি সুলতানের ক্ষমতা মাছ, বনভাদরে গাছ-গাছালি, পশু-পাখি, জমিতে ফল-ফসলে নির্দেশক নাম অব্যাহত থাকে। মগ-মঙ্গেলিয়ান-চীনা মানব সম্মুখ ফটিকছড়ি এলাকার জনজীবন শাস্তিতে সেরা এলাকা ধারার নিয়ন্ত্রণে এ অঞ্চল দীর্ঘ সময় পরিচালিত হওয়ায় হিসেবে পরিগণিত ছিল। পাহাড়-সমতলভূমি-গিরি-শায়খুল আকবর এটিকে চীনের পাদদেশ হিসেবে চিহ্নিত উপত্যাকায় সবুজের সমারোহের কারণে প্রাকৃতিক করেছেন বলে অনেক গবেষকের তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক ধারণা। নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ ফটিকছড়ি। ফটিকছড়ি উপজেলার উল্লেখ করা সঙ্গত যে হ্যারত নুহের (আঃ) পুত্র ইয়াফেস এর মধ্যবর্তী এলাকার সমতলভূমি জুড়ে অবস্থিত মাইজভাণ্ডার প্রথম স্বত্ত্বানের নাম চিন। গবেষকদের ধারণা হ্যারত নুহের গাম। (আঃ) পুত্র ‘চিন’ এ ভূ-অঞ্চলে বসবাস করায় দেশের নাম মাইজভাণ্ডার গ্রাম শব্দের অর্থ বেলায়তে মোত্লাকা কিতাবের চীন হয়েছে।

ভাষ্য অনুযায়ী ‘মধ্য ভাণ্ডার’-অর্থাৎ যার ‘মধ্যে ভাণ্ডার’ এবং সমুদ্র পথে যোগাযোগে ব্যবস্থা থাকায় চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে অতুলনীয় সম্পদের সমাবেশ রয়েছে। একসময় ফটিকছড়ির বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকের আগমন ঘটেছে। ফলে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা পাহাড়ি মগদের শাসন করলিত ছিল। এলাকায় হিন্দু সন্ত-সাধু খৰি-সন্ন্যাসীদের যেমন আগমন ক্রমান্বয়ে মুসলিম ন্যূনতর পাহাড়িদের কবল থেকে ঘটেছে, তেমনি বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণ-ভাষ্টে এবং সিদ্ধ ফটিকছড়িকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। পুরুষদেরও সমাবেশ দেখা যায়। ইসলাম ধর্ম প্রচারের সমতল ভূমি থেকে বিভিন্নযুগী অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে প্রাকালে চট্টগ্রামে সাহাবাদের অবতরণ এবং অগণিত অলি-এই এলাকায় গড়ে তোলা হয় ভাণ্ডারখনা তথ্য পণ্য পথ্য-দরবেশদের আগমনে ‘তাওহীদ’ প্রচারের কেন্দ্রভূমি হিসেবে

চট্টগ্রামের জনপথ প্রবিত্তার পরশে উজ্জাসিত হয়ে ওঠে। ফটিকছড়ি নামকরণের সঙ্গে প্রাকৃতিক স্বচ্ছতার বিষয়টি জড়িয়ে আছে। “ফটিক স্ফটিক শব্দের অপদ্রুণ। স্ফটিক শব্দের অর্থ স্বচ্ছ। ছড়ি অর্থ প্রবাহী অর্থাৎ স্বচ্ছ প্রবাহী। স্ফটিক নিখাদ-পরিস্কার বিশুদ্ধ এবং প্রবিত্ত শব্দের সমার্থক। পাহাড়ী গোপন বর্ণ ধারা থেকে প্রবহমণ জলধারা সৃষ্টি, ‘ছড়া-খালের’ বিশুদ্ধ পানির সমারোহের কারণে ফটিকছড়ি নামকরণ। স্ফটিকতা মহান আল্লাহর অনুপম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ ধারার মহা সমারোহে পুনরুৎসাহনের ইঙ্গিতবহু প্রাকৃতিক সংযোগ ফটিকছড়ি নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। ফটিকছড়ির স্বচ্ছ পানির স্নোতাধারা বর্ষার প্রবল বর্ষণে সমন্বয় এলাকাক প্রকাশিত হিসেবে প্রাপ্ত পোক তাঁদের দেখ। বন্যার প্রচও স্নোতে সকল আর্জনা ভেসে যায়। এলাকায় দেখা দেয় সজীবতা-স্বচ্ছতা। এমনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নির্মাল পরিবেশে প্রকৃতির অনুপম দান। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দেয়। ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার গ্রামের সন্নিকটে বসবাস করেন বিভিন্ন ধর্ম বর্ষণের বহু পরিবার। এদের অনেকে পৈতৃক পেশা কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। এরা তাদের বিধানগত নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক এবং মানবিক উদার পরিবেশে বসবাস করেন। বিভিন্ন ধর্ম এবং অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন নান্দনিকতায় এরা মানব একেব্রের নৈতিক ফয়সালা হিসেবে একমাত্র সুষ্ঠার প্রতি বিশ্বাস বেগবান রাখতে যত্নবান। মহান আল্লাহ অগণিত বিচ্ছিন্ন সুষ্ঠির কেন্দ্রবিন্দু করেছে নিজের সদাজাতের প্রজাপ্রবণ অস্তিত্বকে। এ অস্তিত্ব বৈষম্য বিভেদে অনৈক্যের পরিবর্তে সাম্য সম্পূর্ণতি অহিংসা অভেদ একেব্রের সহজ সরল সালীল পুর্ণের আহ্বান জানায়। মাইজভাণ্ডার গ্রামে বিশ্ব শাস্তির প্রাসঙ্গিকতায় মানব সাম্য, সহবস্থান ও মানবিক একেব্রের নবচেতনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠেছে মানব সমাবেশের অনন্য নৈতিক কেন্দ্র-ঐশ্বী জলসা ভাণ্ডার। মানুষের অনুসৃত ধর্মের মর্মবাদ তথ্য সৃষ্টিকালের অঙ্গীকার একমাত্র আল্লাহকে মহান সুষ্ঠা হিসেবে মেনে নিয়ে আত্মা জগতের প্রতিশ্রুতি পালন এবং পার্থিব জীবন ধারণে তথ্য কর্মকাণ্ডে নৈতিকতা লালনের নির্দেশিকা প্রদানের বাতিলৰ হচ্ছে ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার। মাইজভাণ্ডার শরিফে তাই ঐশ্বী উন্নততায় লক্ষ লক্ষ মানবকষ্টে গীত হয়,

‘আল্লাহ আল্লাহ রবে কিসের বাদ্য শোনা যায়।
গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী আশেকগণের প্রাণ হারায়।’
মাইজভাণ্ডার শরিফের আধ্যাত্মিক মর্যাদা উপস্থাপন করে সাধক কবি আবদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুরী গেয়েছেন,

উচ্চতর গবেষণার এক অভিনব অভিধান মৌনতার আভরণে এক উত্তাল মহাসমুদ্র

• আলোকধারা ডেক্ষ •

দেখলে ছবি পাগল হবি

ঘরে রাইতে পারবিনা

আঠার আলমে আমার বাবা মাওলানা

-রমেশ

জাগতিক অব্যক্তির মধ্যেও যে আধ্যাত্মিক জগতের অতলাত্মক মহাসমুদ্রের লক্ষ-কোটি মহিমা ব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জ্বলতম দ্রষ্টান্ত মাইজভাণ্ডের দরবার শরীরের স্বনামধন্য আধ্যাত্মিক মহাপুরূষ ‘হ্যরত বাবা ভাণ্ডারী’।

প্রকৃত নাম: শাহসুফি সৈয়দ গোলাম রহমান, তবে আশেক ভক্ষসহ সমগ্র মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তিনি ‘হ্যরত বাবা ভাণ্ডারী’ এই নামেই সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত।

মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রবর্তক হ্যরত শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (১৮২৬-১৯০৩) ভাতুস্পুত্র ও প্রধান খলিফা হ্যরত বাবাভাণ্ডারী (১৮৬৫-১৯৩৭) মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার আধ্যাত্মিক ধারা ও স্বকীয় মহিমার সমন্বয়ে মাইজভাণ্ডারী ইতিহাসে এক নতুন ঝুঁটের সূচনা করেন।

জন্ম: ২৭ আশ্বিন ১২৭০ বাংলা, (১৮৬৫ খ.) সোমবার সকালে জন্মগ্রহণ করে সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.)। জন্মের সপ্তম দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে ছেলের আকিকা উৎসবের দিন তদীয় পিতা বঙ্গ-বাঙ্গাব সমভিব্যবহারে নবজাত শিশুকে নিয়ে গাউসুলায়ম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর খেদমতে হাজির হলে তিনি নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে ছেলের নাম উচ্চারণ করেন ‘গোলাম রহমান’।

হ্যরত কেবলা ও বাবাভাণ্ডারী: পরিবারিক সম্পর্কের দিক থেকে হ্যরত সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.) (বাবাভাণ্ডারী) হলেন মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রবর্তক মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (হ্যরত কেবলা) ভাতুস্পুত্র। শুধু জনসূত্র বা পরিবারিক সম্পর্কের মধ্যে হ্যরত বাবা ভাণ্ডারীর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। হ্যরত কেবলা থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ ফরেজ রহমত অর্জন এবং আল্লাহর অশেষ মহিমায় বাবা ভাণ্ডারীর জীবন গড়ে উঠে এক মহান আউলিয়ার জীবনদর্শনে। আল্লাহর অশেষ মহিমায় ধন্য হ্যরত

বাবা ভাণ্ডারীর সাহচর্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও হয়েছেন ধন্য, পারলেন বিষয়টি উচ্চমাণীয় আধ্যাত্মিক লেনদেনেরই অনেকটা পরশ পাথরের মতো।

মারপ্যাচ মাত্র।

মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রবর্তক হ্যরত কেবলা এ তৃরিকার অতপর হ্যরত সাহেবানী বাবাভাণ্ডারীকে উদ্দেশ্য করে বলতে যে বৃক্ষ রোপন করেছেন তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণলাগলেন, ‘বাবা আপনি যখন তাঁকে না দেখে থাকতে পারেন ভূমিকা পালন করেছেন হ্যরত বাবাভাণ্ডারী। বিশেষ করেনা, সামনে পেলেই আপনার প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করেন সময়ের বিবর্তনে হ্যরত বাবাভাণ্ডারীকে কেন্দ্র করে এবং তিনিও প্রহার করেন, এমতাবস্থায় আপনি কিছুদিন মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রচার ও প্রসারে গড়ে উঠে একবাইরে ‘ছায়েরে’ চলে যান। যখন আপনাকে দেওয়ার সময় মহৎ-মহান কর্মজ্ঞ। এককথায়, মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার হ্যরত তখন হ্যরত আপনাকে তালাশ করে যা দেওয়ার দিয়ে স্থগিত হ্যরত কেবলা, আর এর বিকশিত রূপ হ্যরতদেবেন। তাঁর কর্তব্যকর্ম ও হায়াত আরো বাকী আছে। বাবাভাণ্ডারী।

আপনি কি এই সময়ে তাঁকে বিদ্যায় দিতে চান? আউলিয়াদের হ্যরত কেবলা থেকে ফরেজ রহমত: হ্যরত কেবলার পৌত্রনির্ধারিত জাগতিক কাজ শেষ হলে তাঁরা আর ক্ষণকালও হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর বর্ণনা মতে, থাকেন না, তাঁর কালামে তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। এখন হ্যরত কেবলার ভাতুস্পুত্র মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলাম এমতাবস্থায় আপনি কিছুদিন দূরে থাকা নিতান্ত দরকার। রহমান (ক.) হ্যরত কেবলার প্রতি পতঙ্গতুল্য আশেক ‘হ্যরত সাহেবানীর এই আদেশে বাবাভাণ্ডারী ছায়েরে বের হিলেন। হ্যরতও তাঁকে আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রীতির নজরেহয়ে যান।’

দেখতেন। একদিন বাবাভাণ্ডারী এসে হ্যরত কেবলার কদমরেয়াজত: হ্যরত বাবাভাণ্ডারী নদী-সাগর, বন-জঙ্গল, পাহাড়-শরীর দুখানাকে এমনভাবে পাগলগ্রাম হয়ে জড়িয়ে ধরলেন পর্বত ইত্যাদি ছায়ের করে ৪০ বছর বয়সে বাড়ি ফিরে যে, হ্যরত কেবলা কিছুতেই তাঁকে ছাড়াতে পারলেন না। আসেন। এ ছায়ের বা সফর ছিল তাঁর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ এমতাবস্থায় বেশকিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরসাধানারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। পরিবারের মধ্যে ফিরে আসার হ্যরত কেবলা দারুণ জজবা হালতে তন্মুখ অবস্থায় তাঁকে পরও তিনি ছিলেন পরিবারের অন্য দশজন সদস্য থেকে (বাবাভাণ্ডারীকে) চেয়ারের হাতল দ্বারা প্রহার করতে আরম্ভ সম্পূর্ণ আলাদা। দৃশ্যত নিজ পরিবারের মধ্যে থাকলেও করলেন। প্রহারে বাবাভাণ্ডারীর সমস্ত বদন মোবারক অসাধারণ সাধনা, সংযম ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন রক্তাক্ত করে মাথার চুল মোবারক ধরে পৰিত্ব মুখ্যমণ্ডলকে পরিবার-মুক্ত, সংসার মুক্ত একজন স্বত্ত্ব ব্যক্তিত্ব। যেন উপর দিকে ঘুরিয়ে অনিন্দ সুন্দর নূরানী চেহারার প্রতি ‘মরিবার পূর্বে মরিয়া যাও’ এ পৰিত্ব বাচীরই বাস্তবায়ন। জজবাতি দৃষ্টি নিষ্কেপে বলতে লাগলেন, ‘ইউসুফের মত একাধারে সাত আট দিন পর্যন্ত একই অবস্থায় অনিদ্রায় ও সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি।’ অনাহারে বসে থাকতেন। হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বলেন, ‘এমতাবস্থায় তাঁর পৰিত্ব হাত মোবারকের উপর ঘন্টার পর ঘন্টা একাধারে আমার দাদী আম্মা হ্যরত সাহেবানী এবং আমার মাতা ও পানি ঢালা হতো, এতে তাঁর শরীরে ঠাণ্ডা কোন প্রতিক্রিয়া জেঠাই শ্বাঙ্গড়ি সাহেবানী’ উপস্থিতি হয়ে অতি কৌশলেক্ষ্য করা যেতো না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর হস্ত নিঃস্তুত বাবাভাণ্ডারীর হাত দুখানা হ্যরত কেবলার কদম শরীর থেকে পানিতে এক অনিবচ্ছিন্ন মহিমা বিরাজমান ছিল। এই পানি ছিলেয়ে নিয়ে ক্ষতস্থান তৈল দিয়ে বেঁধে দিয়ে হ্যরতপান করে অনেকের দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম হতো, সাহেবানী হ্যরত কেবলাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, অনেকের মনক্ষমনা পূরণ হতো। ‘আপনি একি কাজ করলেন? এমন সুন্দর চাঁদের মত নিজ ভাবে কিছুদিন থাকার পর বাবাভাণ্ডারী নিজ জবানে আতুস্পুত্রকে এভাবে প্রহার করে ক্ষতবিক্ষত করা কি আপনার কথাবার্তা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। প্রায় তেইশ বছর

যাবৎ পৰিত্ব জবান বন্ধ রেখেছিলেন। তিনি সাধারণত কোন কথা বলতেন না। কৃটিং যা বলতেন তাও খুব সংক্ষিপ্ত, রূপক ও ব্যঙ্গনাপূর্ণ। অথচ আশ্বর্যের ব্যাপার, এরূপ সাংকেতিক সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা থেকে তাঁর আদেশ-নিষেধ, ইচ্ছা অনিচ্ছা বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অন্তরায় সৃষ্টি হতো না। তাঁর কাছে কেউ কোন বিষয় নিবেদন করার ক্ষেত্রে মৌখিক উচ্চারণ মূখ্য কোন ব্যাপার ছিল না, মনে মনে নিবেদনই ছিল যথেষ্ট। শিষ্য, ভক্ত বা আশেকবৃন্দকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে মৌখিক কোন আদেশ উপদেশ দিতেন না, স্বপ্ন বা ধ্যানমংগল অবস্থায় তাঁর তাঁদের প্রশ্নের জবাব বা প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ পেয়ে যেতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর ওফাতের পরও এধারী অব্যাহত আছে।

হ্যরত বাবাভাণ্ডারীর জীবনপ্রণালী এবং কার্যবলী সবই ছিল আধ্যাত্মিকতার মোড়কে রহস্যবৃত্ত। শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ প্রচলিত নিয়মাবলী তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

পৰিত্ব কোরানে বর্ণিত হ্যরত খিজির (আঃ) এর কার্যবলী হ্যরত মুসা (আঃ) কে বুবিয়ে দেওয়ার পূর্বপর্যন্ত নিজ বুদ্ধি বলে যেন সুফি কবিদের কবিতা; যেখানে ‘সরাব’ প্রকৃত সরাব নহে, ‘সাকী’ রূপসী কোন তর্ষী নহে, সবই রূপক অর্থবোধক।

বেচল (ওফাত বা পরলোকগমন): মানুষের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, তথা পরলোকগমনকে সাধারণভাবে বলা হয় মৃত্যু। আর নবী-রসূল, গাউস, কুতুবগণের পরলোকগমনকে বলা হয় বেচল। হ্যরত বাবাভাণ্ডারী কেবলা সুদীর্ঘ একান্তর বছর ছয়মাস কাল ইহজগতে আধ্যাত্মিক শীলা সমাপন করে ১৯৩৭ সালের ৫ এপ্রিল (২২ চৈত্র ১৩৪৩ বাংলা) রোজ সোমবার ভোর ষটা ৫৫মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল তদানিন্দন বৃটিশ সরকারের উজির নবাব কাজী মোশাররফ হোসেনের হাতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর সমাধি মূলে পৰিত্ব রওজা মোবারকের কাজ শুরু হয়। এই রওজা মোবারককে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ২২ চৈত্র লাখা আশেক ভক্তের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে তাঁর ওরশ শরীর পালিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা, সর্বোপরি ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে বৃটিশ সরকার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে তাদের রেলওয়ে কোম্পানির চার পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যতিক্রমধর্মী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওরশ শরীরের জন্য কনসেশন টিকেটে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিল।

বলাবাহ্ল্য, সে বিশেষ ব্যবস্থা আজও অব্যাহত আছে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের তৎকালীন টীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার আর. এস. ভাইপ্যান কর্তৃক প্রচারিত এই বিজ্ঞাপনে মেলার বিবরণ ও তীর্থ মাহাত্ম্যের যে বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার মাহাত্ম্য এবং এর সামাজিক গুরুত্বের গভীরতা ও বহুমাত্রিক সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা সত্যিই গুরুত্ববহু ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বিজ্ঞাপনে বর্ণিত মেলার বিবরণ ও তীর্থ মাহাত্ম্য: এই পৃষ্ঠামূলি মাইজভাণ্ডার গ্রাম বিশ্ব শতাব্দীর আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠতম দরবেশ, খোদার প্রেমিকগণের হৃদয়মনি গাউসুলামায় হ্যরত মৌলানা সৈয়দ গোলাম রহমান শাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাহেব সন ১২৮৪ ইহিজিরি ১২ জমাদিউসসানি সোমবার প্রাতকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাসার পরীক্ষা সমাপনাতে ২৫ বছর বয়সে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি একাধিকমে ১২ বছর পাহাড়ে, জঙ্গলে, নগরে, প্রাতরে ও গ্রামে থামে ভ্রমণ করত ৪০ বছর বয়সে স্বীয় পীর মরহুম গাউসুলামায় হ্যরত মৌলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ শাহ (ক.) ছাহেবের স্থলাভিক্ত খলিফা রূপে দরবার শরীফে গদীনশীন হন। আল্লাহর প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম এবং জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে প্রত্যেক লোকের প্রতি অপরিসীম প্রীতি সমষ্টি দেশবাসীর প্রতি ভজি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এমনকি সুদূর আফগানিস্তান, পারস্য ও আরব হইতে পর্যন্ত অসংখ্য লোক অহরহ, তাঁহার সমীক্ষে হাজির হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করত নিজনিজ মনকামনা লাভ করিতে থাকে। এরপে ৩২ বছরকাল মহাসমাজে তিনি গদীনশীন থাকিয়া বিগত ১৩৪৩ বাংলার ২২ চৈত্র তারিখ সোমবার পূর্বাহ্নে বেলা ৮ ঘটিকার সময় মানবলীনা সংবরণ করেন। বর্তমানে তাঁহার পবিত্র সমাধিতে প্রত্যহ অসংখ্য লোকের সমাগম হয় এবং নিজ নিজ মনকামনা লাভ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পূর্বোক্ত তারিখ হিসাবে বর্তমান সন ১৩৪৫ বাংলা ২২ চৈত্র বুধবার (৫ এপ্রিল ১৯৩৯) দুই বছর পূর্ণ হইবে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী উক-

তারিখে তাঁহার ওরশ শরীফ বা মৃত্যুবার্ষিকী সাধারণভাবে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যরত বাবাভাণ্ডারী মহাসমাজে সমাপন করা হইবে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ পাওয়া যায় শক্তি বলে আশেক ভঙ্গকুলসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে চুক্ষকের যে, হ্যরত বাবাভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মহিমা শুধু চট্টগ্রাম মত আকর্ষণ করতেন প্রতিনিয়ত। ফলে আশেক ভঙ্গকুল কিংবা বঙ্গ দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা দেশের সীমানারীতিমত প্রদীপের আলোতে পতঙ্গের ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ, বার্মা, পারস্য এবং আরব দেশে পর্যন্ত বাবাভাণ্ডারীর হজরা শরীফে এসে আত্মনিবেদন করত।

এমনকি যারা প্রত্যক্ষভাবে আসার সুযোগ পেত না, তারা দূর হ্যরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী যে তুরিকার থেকে মানসিকভাবে আত্মনিবেদন করে এই মানসিক প্রশাস্তির প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর প্রচার-প্রসার ও জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে ছোঁয়া পেতেন। বলাবাহ্ল্য, এটি যেমন তাঁর জীবন্কালে ছিল হ্যরত বাবাভাণ্ডারী ব্যক্তিক্রমধর্মী এক নতুন যুগের সূচনা তেমনি তাঁর ওফাতের পরও এই আধ্যাত্মিক আকর্ষণ-শক্তি করেছিলেন। নদী যেমন সমুদ্রের সাথে মিজের সৃষ্টির প্রবহমান ধারায় অব্যাহত আছে, বাবাভাণ্ডারীর এই সার্থকতা খুঁজে পায় তেমনি হ্যরত বাবাভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক মহিমার সুন্দর বর্ণনা মেলে কবিয়াল রমেশ শীলের মহিমাগুণে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর গানে-

জনগোষ্ঠির মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়ে তুরিকা প্রচারে সার্থকতাকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌছানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার ইতিহাসে ব্যক্তিক্রমধর্মী নতুন যুগের সূচনা করেন হ্যরত বাবাভাণ্ডারী।

সাধারণভাবে বাকরন্দি থাকলেও তাঁর দর্শন লাভই ছিল এক মহান সৌভাগ্যের কথা। এতে রীতিমত স্রষ্টার সাম্রিধ্য লাভের বাবাভাণ্ডারীর এই সুমহান আধ্যাত্মিক মহিমা ব্যক্তি হৃদয়ের পুলক অনুভব করতেন আশেক ভঙ্গকুল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রভাব নির্বিশেষে যাঁরাই তাঁর দর্শন লাভে হাজির হতেন তাঁরা স্বৰ্ব বিস্তার করেছিল প্রত্যক্ষভাবে। বাবাভাণ্ডারীর ব্যাপক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যরত বাবাভাণ্ডারীর মধ্যে স্বয়ং মহান জনপ্রিয়তার বিষয় অবগত হয়ে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের সৃষ্টিকর্তার প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেতেন। বিভিন্ন ধর্মের আশেক রেলওয়ে বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগ নিয়ে ১৯৩৯ সালে ভঙ্গকুলের এই পবিত্র দর্শন লাভের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় বাবাভাণ্ডারীর ওরশ শরীফ উপলক্ষে রেলওয়ের ভাড়া সংক্রান্ত কবিয়াল রমেশ শীলের গানে-

দেখলে ছবি পাগল হবি

ঘরে রাইতে পারবি না

আঠার আলমে আমার বাবা মাওলানা ॥

কী মোহন মুরতি বাবার,

যে দেখেছে জন্মের মত হয়েছে উদ্বার,

ও তার আরশ কুরসী সাগর পাহাড় দেখবার বাকি থাকে না।

তাঁকে ভক্তিভাবে করলে দরশন

যীশু দেখে খস্টানেরা, ফয়া বুদ্ধগণ

হিন্দু দেখে মনমোহন শ্রী নন্দের কালাসোনা ।

মুখ দর্শনে অসম্ভুক্তি বিনাশ

হস্ত বক্ষ লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ ২ পাতক নাশ,

রমেশেরী মনে উল্লাস, দেখতে চৱণ দু'খানা ॥

১১

কোন কথা না বলে, কাউকেও বায়ত না করিয়ে আধ্যাত্মিক

ফকিরদের সমাবেশ ঘটে উল্লেখযোগ্যভাবে। বলাবাহ্ল্য, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ওরশ সমূহের মধ্যে ২২ চৈত্রের ওরশ এদিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার; যা

বাবাভাণ্ডারীর আরেক বৈশিষ্ট্য হল আউল-বাউল ও মজজুব শ্রেণীর ফকিরদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করার ক্ষমতা। বাবাভাণ্ডারীর ২২ চৈত্রের ওরশ উপলক্ষে এই শ্রেণীর ফকিরদের সমাবেশ ঘটে উল্লেখযোগ্যভাবে। বলাবাহ্ল্য, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ওরশ সমূহের মধ্যে ২২ চৈত্রের ওরশ এদিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার; যা

মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার ক্রমবিকাশের ধারায় গবেষক

মহলকে নতুন নতুন চিঞ্চার খোরাক যোগাবে।

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, শরিয়ত ও মারেফত উভয় দৃষ্টিকোণ

থেকে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার বিকাশ ও প্রচার প্রসারে

হ্যরত বাবাভাণ্ডারী এক ব্যক্তিক্রমধর্মী নতুন যুগের সূচনা

করেন।

স্বনামধন্য বাঙালি মণীষী মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর ডষ্টেরেট ডিগ্রি অর্জন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪০ সালে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যক্তিক্রমধর্মী এ মেধাবী ছাত্র স্বর্ণপদক পেয়ে এম. এ পাশ করে অতি সচেতনভাবে (আমার ধারণা: গাউসুল আয়ম শাহ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে) Sufism in Bengal এ শিরোনামে ডষ্টেরেট ডিগ্রির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬), ফরেজপ্রাণ একান্ত অন্তরঙ্গ ভাব-শিয়া, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মরহুম আমিনুল হক শাহের পুত্র মুহম্মদ এনামুল হকের বর্ণনা মতে, তাঁর পিতার কাছ থেকেই তিনি প্রাথমিকভাবে মাইজভাণ্ডার বিষয়ক তথ্যগুলোর সন্ধান পেয়েছেন।

সে সময়ের অবিভক্ত বাংলায় ‘সুফিজম’ নিয়ে তাঁর এ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর গবেষণা ভারতবর্ষের এ অঞ্চলে সুফিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের এক বস্তুনির্ণয় ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে।

Sufism in Bengal এই পিএইচডি থিসিসে তিনি মাইজভাণ্ডার বিষয়ে যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তা এই দরবার নিয়ে আরো উচ্চতর এবং গভীরতর গবেষণার দিক নির্দেশনা মাত্র। তিনি মাইজভাণ্ডার শরীফের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য তুলে ধরে বলেন: “মাইজভাণ্ডার দরবার হলো বলে ফকিরদের একমাত্র জাগ্রত আড়ত কেন্দ্র”। বলাবাহ্ল্য, ১৯০৬ সালে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের পর বিশ্ব শতাব্দীর শুরুতে তিনি চার দশক ধরে এই ‘জাগ্রত আড়ত কেন্দ্রে’ মূল আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠিক ছিলেন- নীরবতার আভরণে এক উত্তাল মহাসমুদ্র- হ্যরত বাবা ভাণ্ডারী।

টীকা ভাষ্য

আঠার আলম: আঠার (১৮) একটি সংখ্যা। এটি প্রচলিত ‘আঠার হাজার আলম’ শব্দের সংক্ষেপিত রূপ। আলম অর্থ জগৎ। মহান রাবুল আলামিন পৃথিবী নামক এ গ্রহ ছাড়াও অসংখ্য আলম বা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যেমন ফেরেশতা জগৎ, জীৱ জগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র জগৎ, প্রাণী জগৎ, বায়ু জগৎ ইত্যাদি। সুফি পরিভাষায় আলমে মালাকুত, আলমে নাসুত, আলমে জবরুত ইত্যাদি। সুফিগণের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদে আছে। যিনি যত মকাম (স্তর) পর্যন্ত পৌছেছেন তিনি তত মকামের কথা বলেছেন মাত্র। সাধারণ মানুষের চিন্তার অতীত এ ধরণের অগণিত জগতের যথার্থ সংখ্যা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন। যেহেতু তিনি এ সমস্ত জগতের স্মষ্টা ও প্রতিপালক। এ কারণেই তিনি ‘রাবুল আলামিন’ অর্থাৎ বিশ্বজগৎ সমূহের প্রতিপালক।

আর্শ: এ আরবি শব্দের অভিধানিক অর্থ চৌকি বা সিংহাসন। এখানে আর্শ মানে সর্বব্যাপী আল্লাহর আসন তথা সৃষ্টি সমূহের পরিচালনা কেন্দ্র। আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টি জগৎ সমূহের উপরে এর অবস্থান। এক কথায়, এটি সৃষ্টি জগৎ সমূহের ছাদ (ইবন কাসির)। পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ৫৪নং, সূরা ইউনুসের ৩২নং, সূরা আল বুরজের ১৪ ও ১৫ নং, সূরা ফোরকানের ৫৯ নং এবং সূরা তাওবার ১২৯নং আয়াতে পবিত্র আরশের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন: সূরা তাওবার উল্লিখিত আয়াতের বর্ণনা: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি মহা আরশের অধিপতি।

কুর্শি [কুরসি]: অভিধানিক অর্থে চেয়ার। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৫৫ নং আয়াতে কুরসির বর্ণনা আছে এভাবে—আল্লাহর কুরসি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। ‘কুরসি’ আল্লাহর আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কল্পনাতীত মহিমান্তি এ কুরসির আছে চারটি খুঁটি। প্রতিটি খুঁটির দৈর্ঘ্য সাত আসমান ও সাত জমিনের চেয়েও দীর্ঘ। (মুসলিমসূত তানজীল)।

বিশু: যীশু খ্রিস্ট; খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক। কুরআনের পরিভাষায় হ্যরত দৈসা নবী (আ.)

ফয়া: বৌদ্ধ স্প্রে এবং বৌদ্ধ-দেবতা উভয় অর্থে ব্যবহৃত।

মদনমোহন: ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কুদরত: শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা। আল্লাহর যে শক্তি

ফিতরাতকে (প্রকৃতিকে) সৃষ্টি ও পরিচালিত করে থাকে।

এলমে লদুন: কোন মাধ্যম ছাড়া জানের নামই এলমে লদুনী। তাসাউওফের পরিভাষায় আল্লাহ প্রদত্ত এমন বিশেষ জন্ম যা শুধুমাত্র আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায় বিশেষ নির্বাচিত ব্যক্তিদের এটি দান করা হয়। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হ্যরত

থিজির (আঃ)। এ বিশেষ জ্ঞান শিক্ষার জন্যে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে স্বয়ং মুসা নবী (আঃ) কে থিজির (আঃ) এর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফ-এ এর বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

দিলের পর্দা: অন্তরে তথা কলব এবং রহের উপর আবরণ।

গোনাহ কিংবা বিশ্বরপের কারণে মানুষের অন্তরের উপর আবরণ বা পর্দা পড়ে যায়। ফলে মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশ বাধাহস্ত হয় পদে পদে।

মুর্দা কলব: কলব: অভিধানিক অর্থ পরিবর্তনশীল। পবিত্র প্রবর্তন করেন। একটি মুহাম্মদীয়ুল মসরব। অন্যটি হাদিসের বর্ণনা মতে, ‘অবশ্যই মানব জাতির শরীরে আহমদীয়ুল মসরব। এ দুটি নামে মহানবী (দঃ) পূর্ববর্তী একটুকরা মাস্পিণ্ড আছে সেটা যদি সঠিক থাকে তাহলে ঐশ্বী কিতাবসমূহে সমৰ্থিত হয়েছেন। মহানবীর (দঃ) মাতা সমস্ত শরীর সঠিক থাকে আর যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, হ্যরত বিবি আমিনা গৰ্ভবস্থায় কয়েকবার স্বপ্নে দেখেন যে, তাহলে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়।’ নবী করিম (দ.) বলেন, তাঁর পুত্রের নাম যেন ‘আহমদ’ রাখা হয়। অন্যদিকে ‘তোমার কী জান এটা কি? এটা হচ্ছে ‘কলব’।’ অন্য আকীকার সময়ে সমবেত মেহমানদের উপস্থিতিতে অদৃশ্য হাদিসের বর্ণনায়, ‘মোমেনের কলব আল্লাহর আরশ।’

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেলায়ত মূলত: মহান স্বীকৃত আল্লাহর সঙ্গে প্রেম মহবত জনিত বিষয়। আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির হৃদায়ত প্রাপ্তির সুবিধার্থে বিশেষত্বপূর্ণ দুটি ধারা

একটি ইঙ্গিতে হ্যরত খাজা আবদুল মুতালিব শীয় পোত্রের নাম মানুষের বাম দুধের দুই আঙ্গুল নীচে কলবের অবস্থান। প্রায় রাখেন ‘মুহাম্মদ’। ‘মুহাম্মদ’ অর্থ ‘চরম প্রশংসিত’। ‘আহমদ’ স্ট্রবেরী সাইজের ওই বিশেষ মাংস পিন্ডটি সচল বা জারি অর্থ ‘চরম প্রশংসাকারী।’ এ দুটি নামের একত্রিত রূপ হচ্ছে থাকা মানে এই মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ। মোজাদ্দেয়ায় ‘ইনসানে কামিল’—তথা পরিপূর্ণ হাকীকত। আখেরী নবী (দঃ) তুরিকার জিকির সাধনায় লতিফার মধ্যে প্রথমটিই হল নবুয়াত ও রেসালতের সীল মোহর হিসেবে দুটি নামেই ‘কলব’। গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যে ভরপুর এবং বহুমাত্রিক বিশ্বব্যাপী সমৰ্থিত। এ দুটি নামে ‘তাওহীদের’ বিচিত্র ধারার ব্যঞ্জনার এ কলব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ১২৪টি আয়াত প্রকাশ ঘটেছে। এ দুটি নামে দার্শনিক রহস্য লুকায়িত আছে।

একটি ইঙ্গিতে হ্যরত খাজা আবদুল মুতালিব একটি স্বপ্নের বর্ণনা দেখেন, আল্লাহর হাতে। তাই সূরা তাগাবুনের ১১২নং আয়াত তাঁর পিঠ থেকে একটি শিকল বের হয়েছে। শিকলের একটি স্মরণযোগ্য: যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর কলবকে মাথা আসমানে একটি মাথা পূর্বপ্রাপ্ত আল্লাহ হেদায়ত দান করেন।

পর্যন্ত এবং একটি মাথা পশ্চিম প্রাপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছুক্ষণের পাহাড় জলে সুরমা বিকাশ নূরের তজল্লায়: হ্যরত মুসা (আ.) মধ্যে শিকলটি একটি গাছে পরিণত হয়। গাছটির প্রতিটি বনী ইসরাইলীদের বিশেষ প্রভাবে আল্লাহকে চর্ম-চোখে পাতা সূর্যের আলোর চেয়ে স্বত্ত্ব গুণ বেশি আলোকোভাসিত দেখার একান্ত বাসনায় নির্দেশান্বয়ায় তুর পাহাড়ের দিকে ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের জনগণ ওই গাছের ডালের সঙ্গে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর নূরের তজল্লি (ওজ্জল) জড়িয়ে ছিল। কুরাইশের কিছু লোকও কিছু কিছু ডাল আঁকড়ে সহ্য করতে পারেননি। আল্লাহর নূরের তজল্লিতে তুর ধরেছিল। আর কুরাইশের কিছু লোক গাছটি কাটার ইচ্ছা পাহাড়ের মাটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে পোড়া মাটিই হয়েছে করছিল। তারা যখন এ উদ্দেশ্যে গাছের নিকটবর্তী হচ্ছিল, মানুষের চোখের সুরমা।

তখন খুবই সুন্দর সুঠাম এক যুবক এসে তাদের সরিয়ে ফিতরাতকে (প্রকৃতিকে) সৃষ্টি ও পরিচালিত করে থাকে। পিএইচডি দিচ্ছিল। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারণগ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন যে, থিসিস, যা পরে ‘বঙ্গে সুফি প্রভাব’ এই শিরোনামে পুস্তক ‘আপনার বৎশে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন, পূর্ব প্রাপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে পশ্চিম প্রাপ্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাঁর অনুসরণ করবে থেকে প্রকাশিত এনামুল হক রচনাবলীতে এটি সংকলিত হয়। এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা তাঁর প্রশংসার স্তুতি প্রকাশ করবে। এ কারণে হ্যরত আবদুল মুতালিব পোত্রের

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং
বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্মানে

• জাবেদ বিন আলম •

নাম রাখেন ‘মুহাম্মদ’। সর্বত্র প্রশংসিত হ্যরত কারণে এ নাম পরিপূর্ণতা জ্ঞাপক। হ্যরত আদম (আঃ) হতে হ্যরত ইসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী তাঁর আগমন সংবাদ স্ব উম্মতদের অবহিত করেছেন। তাঁর প্রতি এতো বেশী প্রশংসন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, বিশ্ব ভ্রান্তে অন্য কেউ এক্ষেপ প্রশংসিত হননি। কিয়ামতের দিন তিনি ‘মকামে মাহমুদ’ হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হবেন এবং ‘লিওয়ায়ে হামদ’ প্রতাকা প্রাপ্ত হবেন।

মাওলানা আশরফ আলী থানবী তাঁর ‘নশরতুর ফি জিকরিল হাবীব’ কিতাবের ৩১৫-১৬ পৃষ্ঠায় হজুর (দঃ) এর ‘আহমদ’ নামের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। নশরতুর কিতাবের সার সংক্ষেপ অন্যায়ী লক্ষ্য করা যায় মহানবী (দঃ) এর দুটি নাম রয়েছে। একটি হচ্ছে ‘মুহাম্মদ’ অপরটি হচ্ছে ‘আহমদ’। মুহাম্মদ নামটি বিশ্বজগতের ত্রাপকর্তা রূপে বিকশিত হয়েছে। এ নাম দুয়ের প্রভাবে সকল নবী ও ওলী দুর্বারায় চিহ্নিত হয়েছেন। যেমন, হ্যরত আদম (আঃ) মুহাম্মদী মসরবের এবং তাঁর পুত্র হ্যরত শীস (আঃ) আহমদী মসরবের নবী। হ্যরত রাসূল (দঃ) এর ‘আহমদ’ নাম আল্লাহত্বালার আদি সৃষ্টি এবং এ নামটি রাসূল (দঃ) এর বেলায়তী শান ও ক্ষমতার পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুসা! তুমি বিন ইসরাইলকে বলে দাও, যে কেউ আমার কাছে আসবে সে যদি ‘আহমদকে’ অস্মীকারকারী হয় তবে তাকে দোষখে নিষ্কেপ করবো। হ্যরত মুসা প্রত্যুষের বলেন, হে খোদা আহমদ কে? মহান আল্লাহ বলেন আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কসম করে বলছি যে তাঁর চাইতে বেশি সম্মানিত আমার নিকট আর কেউ নেই। তাঁর নাম আমার নামের পাশে আরশের উপর আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টি করার বিশ লাখ বৎসর পূর্বে লিখে রেখেছি। উয়নুল আস্মার প্রাপ্তে হ্যরত বারীদা (রাঃ) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে হজুর (দঃ) এর নাম ‘মুহাম্মদ’ এবং ‘আহমদ’ রাখার জন্যে হ্যরত আমিনা’র প্রতি স্বপ্নাদেশ ছিল বলে উল্লেখ আছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, “আর যখন ইসা ইবনে মরিয়ম বলেন, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ-

প্রেরিত রাসূল এবং আমার প্রতি অবর্তীগ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং পরবর্তী সময়ে আগমনকারী এক রাসূলের সুস্থিত দাতা, যাঁর নাম হবে “আহমদ”- (আয়াতাশ-সুরা সাফ: ৬১:৬) এ জন্যে সাধক কবির ধ্যানমণ্ডল কলমে প্রকাশ পেয়েছে, “আহমদের নূরের উজ্জ্বলতাতে আদমের অস্তিত্ব বিকশিত। আল্লাহত্তা’লা নিজেই এ আকৃতি স্মষ্টা এবং নিজেই বিকশিত।”

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে ‘মুহাম্মদ’ মসরবের ন্যূনত্বাধীনীরা প্রধানত এ ধরণের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক এবং পর্যবেক্ষণের স্থিত রূপ হচ্ছে প্রেমের বিকাশ। অন্যদিকে ‘আহমদ’ নামটি যেহেতু আরশে লিখিত সেহেতু এটির বহিঃপ্রকাশ প্রেমভিত্তিক- যেটি মূলতঃ মেরাজের পরিব্রান্ত রাতে ‘যুমানাকারে ইশ্ক’ তথা প্রেমালিঙ্গনের তানহায়ী (একাকীভূত) মুহূর্তের বিষয় হিসেবে পৃথিবীবাসীর নিকট বাহিত হয়।

মুহাম্মদীয়ুল মসরব এর নবী:

ন্যূনত্বের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক ধারায় লক্ষ্য করা যায় হয়রত আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পর জনমানবহীন অপরিচিত মর্ত্যভূমিতে পতিত হয়ে কর্ম অবস্থা অতিক্রম করতে থাকেন। এমন এক পর্যায়ে আদম-হাওয়া পরম্পরার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরো বিশাদ, নৈরাশ্য, হতাশা এবং মনোযাতনায় নিমজ্জিত হন। প্রথমতঃ আল্লাহর সরাসরি আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়তঃ হয়রত আদম-হাওয়ার পারাম্পরিক বিচ্ছিন্নতায় উভয় প্রকৃতির বিচ্ছেদ বেদনায় বিদীর্ণ হৃদয়ের আকৃতি এবং কান্নার মধ্যে অজানা ঠিকানার সন্দান প্রাণির লক্ষ্যে দীর্ঘ সময়ের আহাজারি থেকে প্রেমের পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়রত আদম (আঃ)। এরপর তাঁদের পরাম্পরার মিলের সন্তুষ্টি, ওহী প্রবর্তন এবং পার্থিব বিষয়ে উভয়কে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে দীক্ষা প্রদান, পার্থিব জীবন প্রবাহ চলমান রাখার স্বার্থে প্রাকৃতিক বিষয়াদিতে জ্ঞান দান, পার্থিব উপকরণ সংগ্ৰহ, মানব বৎশ বিস্তার, মানুষে মানুষে মতানৈক্য, দুর্দশ সংঘাতসহ প্রত্যেক সামাজিক এবং পার্থিব বিষয়ে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুলে দেয়া হয়। পৃথিবীতে মানব জাতির বসবাস এবং ক্রিয়াকলাপ জাতীয় ধারাটি মূলতঃ পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক। হয়রত নূহ (আঃ) হয়রত ইব্রাহীম (আঃ), হয়রত মুসা (আঃ)সহ অনেক পয়গম্বর মুহাম্মদীয়ুল মসরব এর নবী। হয়রত নূহ (আঃ) এর জীবনপঞ্জী এমনকি স্থীয় পুত্র কেনেন এর পিতৃ বিরোধিতা, মহাপ্লাবন, নতুন করে পৃথিবীর মধ্যে মানব বসতি স্থাপন-এ সকল ঘটনাপঞ্জী পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অস্তর্গত। হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) এর তাওহীদ

বিষয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে অনেক আয়াত বিবৃত যাদুকরদের পরাভূতকরণ এবং এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের হয়েছে। হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) বাল্যাবস্থা থেকে মৃত্যুপূর্জাইমান গ্রহণ ও হয়রত মুসাকে আল্লাহর প্রেরিত নবী হিসেবে বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে অনেকে স্থীকৃতি দান, নীল নদীতে অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করা, তুর বিভিন্ন নক্ষত্র পূজা করেন। তা লক্ষ্য করে তিনি একটি পর্বতে আল্লাহর দর্শন প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা, বনী ইসরাইলের নক্ষত্রে স্থীয় রব সাব্যস্ত করেন। কিন্তু তাঁর রব সাব্যস্তকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, বনী ইসরাইল কর্তৃক বার বার নক্ষত্র যথন অদৃশ্য হয় তখন অনুধাবন করলেন, এটি সর্বদা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, মানু-সালওয়ার ব্যবস্থা করা, হয়রত এক অবস্থায় থাকে না। নক্ষত্রের অবস্থানের ঘটে। এভাবে খিজির (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত এবং ঝুপক ঘটনাপঞ্জী দ্বিপ্রতিমান চন্দ, প্রদীপ্তি দিবাকর (সূর্য) সবকিছুতে অবস্থানের সম্পর্কে ধারণা লাভ-সবকিছু মিলে আল্লাহর প্রিয় নবী হয়রত এবং অস্তগামিতা লক্ষ্য করে তিনি নিশ্চিত হন যে, এসব কিছু মুসা (আঃ) এর পর্যবেক্ষণধারা ছিল ব্যাপকতর। মহানবী কখনো স্মষ্ট হতে পারে না। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এমন হয়রত মুহাম্মদ (দঃ) এর হাকীকতী রূপ হচ্ছে মুহাম্মদীয়ুল স্মষ্টার প্রতি আসসম্পর্ন করেন যিনি আসমান-জমিনের একক মসরবে সমৃদ্ধ। তাওহীদ প্রচারকালে স্থীয় গোত্র কর্তৃক বাধা এবং একমাত্র স্মষ্ট। এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ প্রাপ্তি, পবিত্র জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হওয়া, শক্রের সশস্ত্র বিষয়ে হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) পিতা আজরকে আহ্বান আক্রমণের মুখে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, ওহুদ এবং জানিয়ে বলেন, “আপনার রব তো তিনি যিনি ভূমগুল ও হৃনাইনের যুদ্ধে সংঘটিত দৃশ্যপট থেকে বস্ত্রনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা নভোঃ মণ্ডলের স্মষ্টা, আর আমি এ বিশ্বাসের স্বাক্ষ্যদাতা।” অর্জন, মদীনা সাধারণত্বে প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওহীদের প্রতি আনুগত্যের কারণে তিনি দেবালয়ে রক্ষিত জনসম্মতিক্রমে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন, ধর্মীয় সহাবস্থান মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি দেবালয়ের বড় মূর্তিটি এবং বিচার সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা-এ সবই বিচিত্র অবিকল রেখে দেন। তখন লোকালয় থেকে মূর্তি পূজারীর অভিজ্ঞতার ফলুঁধারা।

দেবালয়ে এসে দেখেন যে, বড় মূর্তি ব্যতীত সকল মূর্তি আহমদীয়ুল মসরবের নবী:

ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। মূর্তি পূজারীরা সন্দেহবশতঃ হয়রত মহানবী (দঃ) এর গুণ নাম আহমদীয়ুল মসরব সমৃদ্ধ। তবে ইব্রাহীমকে (আঃ) ডেকে আনে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে এ ধারায় হয়রত শীস (আঃ), হয়রত ইদ্রিস (আঃ), হয়রত মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে হয়রত ইব্রাহীম ঘটনার ইসহাক (আঃ), হয়রত ঈসা (আঃ) প্রযুক্ত মশহুর নবীকে লক্ষ্য বিষয়ে বড় মূর্তিকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। তখন তারা জবাব করা যায়। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, হয়রত আদম (আঃ) এর দেয়, “(ইব্রাহিম) তুমি জান যে, মূর্তিগুলো কথা বলে না।” বিশেষ প্রার্থনা এবং রোনাজারির বিনিময়ে মহান আল্লাহ প্রত্যুত্তরে হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) উল্লেখ করেন যে, “তোমারা হয়রত শীসকে (আঃ) পুত্র হিসেবে প্রদান করেন। হয়রত শীস (আঃ) এর তাওহীদ বিষয়ে প্রত্যয়দীপ্ততা লক্ষ্য করে ক্রমশঃ (আঃ) এর কাজ ছিল দেদায়তের পথ প্রদর্শন করা। ফলে তাঁর উপর বির্যাতন-নির্বর্তন শুরু হয়। অগ্নিকুণ্ডে নিষ্কেপ এবং তিনি পার্থিব বিষয়ে মোটেও আকাশে ছিলেন না। বরং সেখানে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন শক্তির বৈবেষিক বিষয়ে ভাইদের বিরাগ ভাজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহায্যের প্রত্যাশী না হওয়া, দেশ ত্যাগে বাধ্য হওয়া, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরপে পালন করেন। হয়রত মেহমানসহ আহার গ্রহণের কালে মেহমানের সঙ্গে বিরূপ শীস (আঃ) এর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান থাকায় আচরণ, পুত্র হয়রত ইসমাইলকে (আঃ) কোরবানী প্রদানের হয়রত আদম (আঃ) ওফাতের পর্বে ‘মেওয়া’ খাওয়ার বিষয়ে ভুকুম, কাবা গৃহ পুনঃ নির্মাণ সবকিছু বস্ত্রনিষ্ঠ ঘটনা এবং ন্যূনত্বের উভরাধিকারী পুত্র হয়রত শীসকে (আঃ) আল্লাহর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। মুহাম্মদীয়ুল মসরবের অন্যতম নবী দরবারে ফরিয়াদ পেশ করার নির্দেশনা দেন। হয়রত শীস হলেন হয়রত মুসা (আঃ)। তাঁর জন্য ও লালন ফেরাউন গৃহে, (আঃ) বিনা জোড়ায় ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আল্লাহর তরফ থেকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্যের আহ্বান, কিবাতী বেহেস্তী মেওয়ার খাজাঞ্চি নিয়ে ভুর প্রেরিত হয়। এই হৱের সম্প্রদায় কর্তৃক বনি ইসরাইলের উপর নির্যাতন, মানুষে সঙ্গে হয়রত শীস (আঃ) এর আকন্দ সম্পন্ন হয়। আল্লাহর মানুষে বৈষম্যের অবতারণা, দাসদের প্রতি নিহাহ, দাসিক আরাধনা এবং দেদায়তের দিক নির্দেশনা ব্যতীত অন্যকোন স্বৈরশাসকের চরিত্র দর্শন, মুখিজা প্রদর্শনের মাধ্যমেকাজে তিনি মনোনিবেশ করেন নি। এটি আহমদীয়ুল

মসরবের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে হয়রত ইদ্রিস (আঃ) এর ন্যূনত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে। তাঁর মূল কাজ ছিল জনগণকে তাওহীদ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান। এ জন্যে তিনি ওয়াজ-নস্বিত করতেন এবং সর্বদা ইবাদতে বিভোর থাকতেন। তিনি নিজের জামা-কাপড় নিজে সেলাই করতেন। অন্যের জামা-কাপড়ও তিনি সেলাই করতেন। এ জন্যে তিনি কোন প্রকার পারিশ্রমিক নিতেন না। তিনি এতো বেশি ইবাদতকারী ছিলেন যে, একদিকে কাজ করতেন, অন্যদিকে প্রতিটি ফোড়ে আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। অর্থাৎ তাঁর কল্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ততম থাকত। হয়রত ইদ্রিস (আঃ) ওফাতের পূর্বে কোশলে বেহেস্তে প্রবেশ করেন বলে তফসীরকারকরা মতামত পেশ করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্থিত দিলে হিসেবে হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হয়রত ইয়াহুরাব'র প্রতি পুত্র সন্তান আল্লাহর একটি বিশেষ দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইসহাক রাখা নির্দেশ দেয়া হয়। হয়রত ইসহাকে (আঃ) হচ্ছেন নবী ইসরাইল গোত্রের পিতৃপুরুষ। হয়রত ইসহাকের কনিষ্ঠ পুত্র ইয়াকুবের (আঃ) আরেকটি নাম হলো ইসরাইল। বনী ইসরাইল এ নামের মাধ্যমে সংস্থ। হয়রত ইসহাক (আঃ) প্রধানত হেদায়তের দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর ফরিয়াদ কুল হতো বিধায় তাঁর দু'পুত্র ন্যূনত্বে প্রাণ্ত হন। তাঁর জন্য বৃত্তান্ত, নামকরণ এবং কার্যকলাপে আহমদীয়ুল মসরবের বরকত লক্ষ্যনীয় ছিল। পার্থিব বিষয়ে তিনি ছিলেন উদাসীন। হয়রত ঈসা (আঃ) এর জন্য বৃত্তান্ত একটি অলৌকিক ঘটনা এবং মহান স্মষ্ট আল্লাহর অঙ্গীয় ক্ষমতার বিহিতকাশ। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নায়িল হবার পর হয়রত ঈসা (আঃ) যখন তা প্রকাশ করেন তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদায় বুঝে শুনে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। স্বত্বজাতভাবে বক্র মনের অধিকারী ইসরাইলীদের অনেকে হয়রত ঈসার (আঃ) ন্যূনতকে অধিকার করে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করে তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচার শুরু করেন। হয়রত ঈসা (আঃ) দুঃখ মনে তাঁদের (ইসরাইলী) পরিত্যাগ করে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যান। সেখানে কিছু লোককে কাপড় কাঁচতে দেখে জিজেস করলেন, তোমরা কাপড় ধুচ কেন? বরং তাঁর পূর্বে তোমরা নিজেদের অন্তর পরিক্ষার করে নাও। হয়রত ঈসার (আঃ) পক্ষ থেকে মানুসের অন্তর পরিক্ষার করার আহ্বান সম্বলিত ধারা হচ্ছে আহমদীয়ুল মসরবের ন্যূনত্বের বহিঃপ্রকাশ। মানব অন্তর পরিক্ষার করার দাওয়াটির নাম কলেমা। এরপর তিনি কিছু পথ অতিক্রম করে জেলে পঞ্জীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ন্যূনতে

প্রমাণ স্বরূপ কাদা মাটি দিয়ে তৈরী পাথির মধ্যে আল্লাহ'র কুরুমে প্রাণ প্রদান করেন। জন্মান্তকে চক্ষুমান করেন। কুষ্ঠ রোগীকে নিরোগ করেন। মৃতকে জীবিত করেন। কে কার গৃহে কি আহার করেছে তা বলে দেন। কার ঘরে কি রেখে এসেছে তাও প্রকাশ করেন এবং সবাইকে এক আল্লাহ'র উপর ইঈমান আনার আহ্বান জানান। তিনি হারাম বস্তু পরিত্যাগের নির্দেশ দেন। হ্যরত ঈসার (আঃ) সময়ে যেহেতু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় উন্নতির চরম শিখারে পৌঁছে, তখন মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ'র অসীম অঙ্গুলীয় শক্তি সম্পর্কে নানা রকমের অঙ্গতা সূচক অবস্থার অবিশ্বাসের স্থিতি হয়। হ্যরত ঈসা (আঃ) মুয়জিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বীয় জনগোষ্ঠীর ভূষিত অপনোদন ঘটিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র কুরুরত প্রদর্শন করেন। এটি আহমদীয়ুল মসরবের নবুয়াতের ধারা। হ্যরত ঈসা (আঃ) পার্থিব জগতে জমজমা বাদশাহীর অতোচারের মৃত্যু পরবর্তী শান্তি ভোগের ভয়াবহ দৃশ্য অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে জমজমা বাদশাহকে কবর থেকে উত্তোলন করে বাদশাহের নিজের বক্তব্য দিয়ে জনসমূহে প্রকাশ করেন। হ্যরত ঈসা (আঃ) সহজ সরল জীবন অতিবাহিত করতেন এবং প্রায়শ নিরলসভাবে ভ্রমণে থাকতেন। তিনি বলতেন, ‘দুনিয়ার ঘর তৈরি করা ঠিক নদীর তরঙ্গের উপরে ঘর তৈরির অনুরূপ।’ হ্যরত ঈসা (আঃ) গৃহ সংস্কার করেন নি। তাওইদ প্রচারের এক পর্যায়ে তিনি বনী ইসরাইলীদের ক্ষোভ ও ক্ষোধের শিকার হন। তিনি তাঁর সহচর এবং অনুসারীদের নিয়ে আইনে-সলুক নামক একগৃহে অবস্থানকালে ইসরাইলীদের আক্রমনের মুখে আল্লাহ'র তাঁকে অলৌকিকভাবে আসমানে উঠিয়ে নেন। পবিত্র কুরআনে এটানার বিশদ বর্ণনা আছে। পরবর্তী সময়ে হ্যরত ইমাম মাহদীর সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন এবং মহানবী (দঃ) এর নবুয়াতের অধীনে পৃথিবীতে অবস্থান করে আল্লাহ'র একত্ববাদ প্রচার করবেন, ঘর-সংসার করবেন এবং ওফাতের পর মদীনা-মনোয়ারার পবিত্র রওজাপাকে দাফন হবেন। বেলায়তে মোত্লাকা কিতাবে হ্যরত ঈসা (আঃ) এর মসরব সম্পর্কে উল্লেখ আছে। হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়, “তিনি সামাজিক দহরম হইতে নিরিবিলি জীবন যাপন করিতে ভাল বাসিতেন এবং প্রকাশ্য ত্রিয়াকলাপ হইতে অস্তরের ভালবাসাকেই প্রাধান্য প্রদান করিতেন। একদা হ্যরত ঈসা (আঃ) উপসনাকারী একটি দলের নিকট জিজ্ঞাসা

করিলেন, “তোমরা কে?” উত্তর পাইলেন “আমরা ইবাদত বন্দেগীকারী” অর্থাৎ সংসার বিবাগী। তিনি প্রশ্ন করিলেন, “কেন ‘বন্দেগী-ইবাদত কর?’” উত্তর পাইলেন আমরা খোদার নরকাণ্ডিকে ভয় করি এবং তাহা হইতে বাঁচিতে চেষ্টা করি।”

অতপর সামনে অগ্রসর হইলেন এবং এক দল রাহেব বা পাদ্রীকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, “তোমরা কাহার ইবাদত করিতেছ?” উত্তর পাইলেন, “আমরা খোদার দর্শন আশায়

আছি। বেহেশ্ত বা স্বর্গকে নিজ আবাসে পরিণত করিতে ১. প্রকরণ এবং এর প্রয়োজনীয়তা

চেষ্টা করিতেছি যা তাঁহার আউলিয়া বা সিদ্ধপূর্বক বস্তুদের (Methodology and its necessity):

জন্য তৈয়ার করিয়াছেন।” হ্যরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ'র রাব্বুল আলামিনের অস্তহীন বহু বিচ্ছিন্ন মখলুকাতের “খোদার উপর তোমাদের দাবী আছে, যাহা তোমরা সৃষ্টি, প্রতিপালন, বিবর্তন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ব্যবহারিক চাহিতেছ, তাহা যেন আদায় করেন।” তৎপর সামনে গিয়া বিষয়াদি এক সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিতান্তই নির্ভুলভাবে সদাসক্রিয় বৈজ্ঞানিক তাহারাও উপাসনায় রত আছেন। পূর্ববৎ প্রশ্ন করিয়া উত্তর চেতনা-নির্ভর। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টা পাইলেন, “আমরা খোদার প্রেমিক। কোনৱপ দোজখের ভয় মানুষের ইন্দ্রিয়গুহ্য নানা প্রকার সহজেরোধ্য দ্রষ্টান্তসহকারে বা বেহেস্তের আশায় তাঁর ইবাদত করিন। আমরা কেবল সাবলীলভাবে বর্ণিত হয়েছে (যেমন: ৬৭:৩-৪, ২:১৬৪, তাঁকে ভালবাসি এবং তাঁর শানে জালালের নিকট মাথা নত ৭:৫৪ প্রভৃতি)। মানুষের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, করি।” তখন হ্যরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, “তোমরা খোদার অর্থনৈতিক, নৈতিক, আয়-ব্যয়, ভোগ-দান প্রভৃতি বিষয়েও প্রকৃত বস্তু, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।” কুরআনে আদর্শ (model) প্রকরণ পেশ করা হয়েছে। আবার হ্যরত ঈসা (আঃ) এর এ নীতি খোদা প্রেমিকদের নির্বিলাস, সীমিত ইচ্ছা-অনিষ্ট নির্ভর করা হয়েছে, যেগুলো আল-পার্থিব বিষয়ে অনাসক্ত সুফিধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেখা কুরআনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যায়। এটি আহমদীয়ুল মসরবের ধারা।

বিভিন্ন শাখায় মানবজাতির বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্জন ও মহানবী (দঃ) শবে মিরাজের পবিত্র রজনীতে দিদারে ইলাহী অগ্রগতি কুরআনের সূত্রাবলীর সাথে সর্বাংশে সঙ্গতিপূর্ণ। এই কালে কার্যত ‘আহমদ’ এর স্বরূপপ্রাপ্ত হয়েছেন। ‘শবে মিরাজ প্রকরণ বা methodization বস্তুজগত, জীবজগৎ, বৃক্ষজগৎ, মুআনাকারে ইশ্ক’ প্রকৃত পক্ষে মানবজগতে মুহাম্মদী মানবজগৎ, ভাবনাজগৎ এমনকি মনুষ্য উচ্চাবিত যন্ত্রজগতেও হাকীকত অনুযায়ী আল্লাহ'র প্রেমিকের সিলসিলার বহিপ্রকাশ দৃশ্যমান। অতএব, প্রকরণ (methodization) ফর্মলা দৃশ্য ও মাত্র। মহানবী (দঃ) আহমদীয়ুল মসরবের জাত সত্তা হওয়ায় দৃশ্যাতীত সকল জগতে প্রাকৃতিক স্বত্ত্বসিদ্ধভাবে অধিষ্ঠিত ও সৃষ্টিগতভাবে তিনি এর ধারক-বাহক। একারণে পবিত্র ত্রিয়াশীল। অন্যথায় কোন কাজ বা সূজন সুশ্রূত্ব, কর্মক্ষম কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “আল্লাহ'র এবং তাঁর মালায়েক ও উপকারীভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবার নয়।

বা ফেরেশতাগণ নবীর উপর সম্মুখ (রহমত) বর্ণণ করেন। হে অব্যাহতভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা পথ ধরে মানব সমাজ বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং যেসব পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় গড়ে তুলেছে, তার নিরিখে সর্ববিধি সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অভিবাদন কর”- (সূরা দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতি যেন আল-কুরআনে আহজাব: ৩০:৫৬)। (এটি মূলতঃ কেয়াম হিসেবে বাজায়। এই ‘বিজ্ঞানসম্মত’ গ্রন্থের (কুরআনে হাকীম) বিভিন্ন পরিগণিত) ‘মুহাম্মদ’ হচ্ছেন ‘আহমদের’ হাকীকত। শব্দ, বিভিন্ন রূপ বা অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন শব্দ, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে এই হাকীকিতের ধারা নতুন বিভিন্ন সূরা বা অধ্যায়ের তাত্পর্য, ব্যঙ্গন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন হিকমতে প্রবহমান হয়েছে। (চলবে)

বিজ্ঞানের কাছে নব নববরূপে উন্মুক্ত হচ্ছে এবং জিগীয়ু মানুষের জ্ঞান সাধনায় অনুপ্রেণা যোগাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দী-উত্তর আধুনিক কল্যাণ চেতনায় বাজায় ‘বেলায়তে মোত্লাকা’

মাইজভাণ্ডারী প্রকরণ এবং অছিয়ে গাউসুল আয়ম হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং)

[Maizbandari Methodology and Oasi-E-Gausul Azam Hazrat Syed Delaor Hossain Maizbandari]

• মোঃ মাহবুব উল আলম •

এবার মানব সমাজে রাষ্ট্র, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমিতি, এমনকি ক্লাবের পরিচালনায় প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের উপর কিঞ্চিং আলোকপাত করা যাক। মানবসমাজের লিখিত ইতিহাসের এ যাবৎ পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, মানুষ গোড়া থেকেই তার টিকে থাকবার প্রয়োজনে সংবৰ্ধন জীবন যাপন করেছে এবং কিছু না কিছু প্রকরণ বা নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও অনুসরণ করে আসছে। হ্যরত মুহাম্মদ (আঃ) প্রদত্ত দশ অনুজ্ঞা, (ten commandments), রাজা হামুরাবি প্রণীত কোড বা আইন বিধি, স্মার্ট অশোকের প্রচারিত বৌদ্ধবাদীর শিলালিপি প্রভৃতি সমকালীন প্রকরণেরই পরিচায়ক। নবীজী হ্যরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর মিরাজ-পরবর্তী পার্থিব জীবনের অধ্যায়ে ইঙ্গিত রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনে সূচনাতেই লিখিত প্রকরণ প্রণয়ন করেন, যা পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থীরূপ। তাঁর কৈশোর জীবনের ‘হিলফুল ফুজুল’ বা কল্যাণ সংঘের আচরণবিধি এক প্রকার প্রকরণ। একইভাবে আমরা দেখি যে; রাষ্ট্র, সমাজ, ক্লাব, সমিতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, এমনকি পারিবারিক পর্যায়েও কিছু কোড বা আচরণবিধি লিখিত, অলিখিতভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হয়ে আসছে। সংবিধান, গঠনতন্ত্র, আইন, উপবিধি, মোমোরেভোম কিংবা আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন প্রভৃতি এই প্রকরণেরই বিভিন্ন রূপমাত্র। অতএব, মানব সমাজের গঠন এবং প্রগতিশীল স্থিতির প্রয়োজনেই প্রকরণ বা মেথডাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যুগে যুগে প্রেরিত সহিফা, কিতাব, গ্রন্থ, প্রভৃতি বৃহত্তর পরিসরে পদ্ধতিকরণ রূপ।

২. মাইজভাণ্ডারী প্রকরণ প্রণয়নের পটভূমি

(prologue to maizbandari methodization):
নবুয়াত ধারার অবসান (৬৩২খঃ) বিশ্বাসীর সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা। তবে একই সাথে এটাও স্বীকৃত অভিজ্ঞতা যে, মানুষের বেলায়তি (প্রষ্টার নেকট)

ধারার বিকাশ ও ক্রমসম্প্রসারণ রোজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যা সদা বিবর্তনশীল মানব সমাজের বিভিন্ন বর্গ ও অংশের সমকালীন সংক্ষারমূলক চাহিদা, আচার-বিধি ইত্যাদির মডেল বা আদর্শ নির্দেশনা দিয়ে মানুষ ও তার সমাজকে মানবিক গুণের পরিছদে শोভিত করে রাখবে। আল কুরআন ও নবীজী (দঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বষ্টির সাথে তাঁর বান্দাদের সম্পর্ক সরাসরি। নবী-ওলীরা এই সম্পর্কের সহজ সূত্রটা যোগ্য প্রার্থীর হাতে ধরিয়ে দেন। তাই বেলায়তী ধারার অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশ বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্ত্ব।

হ্যৱত গাউসুল আয়ম শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ
মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর মাধ্যমে উদ্বাত (sprouted) মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা বেলায়তি ধারার পবিত্র ঐতিহ্যের ক্রমঃস্মস্রারমান বিবর্তনশীলতার সমকালীন (আমাদের বর্তমান সময় একবিংশ শতাব্দীও এই দাওয়া বা কালের অস্তর্গত) ও চলমান বিকাশ। ওলী-আল্লাহদের নিরবাচ্ছিন্ন ধারার প্রবাহমানতার বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁরা নিজ নিজ হান-কাল-পরিবেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আতঙ্ক করে গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধারণ মানুষের সাংসারিক, পার্থিব উন্নতি ও শাস্তির পাশাপাশি রুহানী বা আত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধির নিশচল প্রশাস্তি অর্জনের কার্যকর নির্দেশনা দিচ্ছেন। হ্যৱত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জাগতিক ও চিময় বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে এ বিষয়টা খোলাসা হয়ে যায়। তিনি সমানভাবে সমকালীন জাগতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভারসাম্যমূলক অবস্থানের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি রুহানী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তালিম দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের শিক্ষা ও নির্দেশনা স্ব-

কালের সীমা পেরিয়েও কার্যকর থাকে।
অছিয়ে গাউসুল আয়ম খাদেমুল ফোকারা হ্যুরত সৈয়দ
দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর এই শিক্ষাকে
প্রণালীবদ্ধ করার দুরহ কাজটা আধুনিকতার
মানদণ্ডসম্মতভাবেই সম্পন্ন করেছেন। এই কাজের যোগ্যতা
তিনি অর্জন করেছেন যুগপৎ একাডেমিক ও রূহনীভাবে।
তাঁর দাদা হ্যুরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাত্র
হিসেবে মেধাবী ছিলেন, তেমনি শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন
প্রসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত। অতএব, পিতৃহারা পৌত্রের শিক্ষার
“বিসমিত্তাহ” মহান দাদার হাত দিয়েই শুরু হবে। তা প্রকৃতি

হাফেজ মণ্ডলা সৈয়দ তফাজ্জল হোসেনের নিকট আরবী, শেষে সঙ্গত উপসংহারে উপনীত হবার দক্ষতার অধিকারী ফার্সী, উর্দু, বাংলা এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করেন ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে। এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে প্রেরণ সামাজিক শ্রেণীগতভাবে তাঁর দাদাজান ছিলেন বড়জোর নিম্ন করা হয়, তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই সুবাদে সমাজের অনুচ্ছতর সামাজিক মাহসেনিয়া মাদ্রাসায়, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ বর্গের লোকদের সাথে সান্ধিয়ই বেশী ছিল তাঁর। তদুপরি করেছিলেন একাধারে তাঁর পিতৃব্য, শ্বশুর ও পৌরে তাফায়জ যে মহান অধ্যাত্মিক বৈভব তিনি অর্জন করেছিলেন, সে হয়রত বাবা ভাণ্ডারী শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান কেবলা বৈভব বিতরণের মুখ্য ক্ষেত্র ছিল এসব মানুষের সমাজ ও কাবা। অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলের রেওয়াজ অনুসারে তিনি তাঁর বর্গ-যা নবীদের ইতিহাসেও লক্ষ্যযীৰ্য। সমাজের বিষ্ণিত, দাদাজানের নির্দেশে কুতুব ইরশাদ হয়রত মণ্ডলা সৈয়দ নিপীড়িত, সহায়-সম্বলাইন, উপক্ষিত মানুষরাই ছিলেন আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারীর (কং) নিকট বায়াতে-নবীদের “বিনামূল্যে, বিনিময়-প্রত্যাশা মুক্ত” কল্যাণকর্ম ও দুর্মাত গ্রহণ করেন। হয়রত আমিনুল হক ওয়াসেলের (কং) ধারণার বীজ বপনের উর্ভর ক্ষেত্র। উনবিংশ শতাব্দীতে হয়রত ইতিষ্কালের পর তাঁর দাদাজান তাঁকে পুনঃবায়াত করেন। আকদসের জীবন্তকালে বাংলার গরিষ্ঠ মানুষের সমাজ-সংস্কার মাহসেনিয়া মাদ্রাসায় তিনি সেখানকার সিলেবাস অনুযায়ী ক্ষেত্রেও ইতিহাসের এই ধারার কার্যকারিতা দৃশ্যমান। কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, মন্তেক, ফিকাহ, উসুল অতএব, হয়রত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কং) কর্ম প্রভৃতি সফলভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর জ্ঞানস্পূর্হ সকলকে জীবনের মিশনের সুবিন্যস্ত, সহজবোধ্য, উপস্থাপন ও মুক্ত করে। তাঁর দাদাজানের ওফাতের পরও এই মাদ্রাসায় প্রয়োগপূর্বক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার গুরুদায়িত্ব তাঁর অধ্যয়ন অব্যাহত থাকে। ১৯১১ সনে এই মাদ্রাসায় ঐতিহাসিকভাবে অভিয়ে গাউসুল আয়মের উপর অর্পিত অধ্যয়নকালে ‘অহম’ শাসনামলের একটি তাত্ত্বিক মাদ্রাসা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃতিকভাবে, ঝুহনীভাবে তাঁর মহান পাহাড়ের মাটিতে অর্ধশোথিত অবস্থায় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, পূর্বতন পুরুষ, শিক্ষক, পালক ও দিশারীর দ্বারা সেভাবেই যে যা তিনি চন্দনপুরাঙ্গ দারোগাবাড়ির মৌলভী আবদুস সালাম নির্মিত হয়েছিলেন, তা দিবালোকের মতো সত্য।

বি.এ সাহেবের মারফত চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পালি আরবী শব্দ ‘দ্বীন’ এবং সংস্কৃত শব্দ ‘ধৰ্ম’-এর ৩৪টিরও বেশী ভাষার প্রফেসরের নিকট পাঠিয়ে দেন। প্রফেসর সাহেব তা প্রতিশব্দ ও অর্থ আছে। এসব অর্থ মানুষের ব্যক্তিক, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন, যা এখনো সেখানে পারিবারিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, আন্তর্জাতিক থাচীন মুদ্রার স্মারক-সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত আছে। তাঁর তীক্ষ্ণ প্রভৃতি সকল প্রকার কর্ম প্রবাহকে বেষ্টন করে থাকে। বৈশিষ্ট্য, বিশাল দূরাদৃষ্টি ও প্রবল জ্ঞানস্পূর্হ কিঞ্চিতও পরিচয় বৃক্ষজগৎ, প্রাণীজগৎ, বস্তুজগৎ নক্ষত্রালোকের বিভিন্ন অবস্থা, এই ঘটনার মধ্যে নিহিত। মণ্ডলা ঝুমির ‘মসনবী শরিফ’, অবস্থান ও বিবর্তন প্রভৃতি বহু বিষয় বুঝাতে আরবী ও ইবনেমুল আরাবীর বিখ্যাত ‘ফুসুসুল হিকম’, খৈয়াম, সাদী, বাংলায় সাধারণতঃ এই দুটো শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে দাশনিক ইকবাল প্রমুখের অমর অজর, গ্রহু ভূবনে তাঁর জীব, বৃক্ষ ও পদার্থের বিভিন্ন অবস্থাগত বুঝাতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ পরিব্রাজন ছিল আটপৌরে অভ্যাসের মতো। সংবাদপত্র, ব্যবহৃত হয়, যেমন custom, manner, behavior প্রভৃতি। যাগাজিন ছিল তাঁর নিত্যসাথী। এখনে তাঁর বাস্তব বা অতএব, ইসলামী কিম্বা সংস্কৃত ঐতিহ্যে ‘ধৰ্ম’ শব্দের ব্যঙ্গনা জাহেরী শিক্ষা ও চৰ্চা সম্পর্কে কিঞ্চিতও অবহিত হলাম। এছাড়া কেবল আচার-অনুষ্ঠান কিম্বা ritual এর মধ্যে সীমিত নয়। মৌলিক জ্ঞানের ফলুধারার সাথে তাঁর যোগাযোগ তো তাঁর মাইজভাণ্ডারী জীবনবোধ বা ত্বরিকা হয়রত আকদসের মহান দাদাজানের মাধ্যমেই ঘটে। এটা সর্ববীকৃত যে কোন জীবন্দশাতেই ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কেবল বিষয় পাঠ করার পাশাপাশি তার গভীরে প্রবেশ করা এবং তা মুসলিম সমাজ নয়, নিপীড়িত, বিষ্ণিত অন্যান্য লোক সমাজও আত্মস্বর করে সামনের পানে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা এই মহীরূপের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে এগিয়ে আসেন। তাঁর জ্ঞানসূত্রেই মানুষের মেধা-মননে নিহিত থাকে, যা জাহেরী জীবন্দশাতেই তাঁর এই ঐহিক ও পারত্বিক (জিসমানী ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শাশ্বত) হয়। অভিয়ে গাউসুল আয়ম হয়রত ঝুহনী যুগেপযোগী পরিমার্জন, প্রসারণ ও উন্নতর বিকাশের সৈয়দ দলেওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং) দশ্যমানভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া সচিত হয়। অঢ়িরেই তাঁর জ্ঞান্তান ও

আল্লাহদের নিবাসস্থলের মতোই সর্বস্তরের কল্যাণকামী গণমানুষের মিলনস্থল তথা ধর্মীয় পরিভাষায় তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

এ অবস্থায় রোজকার এই মহান স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণকামী লোকসভার জন্য স্বীকৃত রেওয়াজ অনুযায়ী সর্ববেষয়িক বহুমাত্রিক প্রকরণ প্রগত্যন জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ, কল্যাণার্থী মানুষরা অনুসরণীয় কোন রূপরেখার অবর্তমানে নিজ নিজ মনোমত আচার-অনুষ্ঠান প্রত্ব পালন করতে থাকেন, যাতে সামগ্রিক গড় সমন্বয়, সুযোগসম্পন্নার অভাব ছিল। তদুপরি এই মহান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মানুষের শৈক্ষিক, নৈতিক জীবনচার, সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও রহানী উন্নয়ন চর্চার প্রশিক্ষণ-আগার হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠায় জীবন-সংশ্লিষ্ট সর্ববিষয়ে পদ্ধতিকরণ বা methodization অপরিহার্য হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, বড়পীর হ্যরত আবদুল কাদের জিলানী (ৱঃ), গরীবে নেওয়াজ খাজা মঙ্গলদিন চিশতী (ৱঃ) মুজাদ্দেদে আলফেসানী শেখ আহমদ সরহিদ (ৱঃ) প্রমুখের দরবারে সমসাময়িকতার সাথে সঙ্গতি রেখে আচার-অনুষ্ঠানের প্রকরণ করা হয়েছিল, যেগুলোর অনেক কিছু এখনো যেসব স্থানে প্রচলিত আছে। এমন কি খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতীয় সমাজের ধর্মীয় ভরকেন্দ্রগুলোতে নির্ধারিত বিধিবদ্ধতা প্রবর্তিত আছে।

বিদ্যান ও বিজ্ঞ অভিয়ে গাউসুল আয়মের আলোকিত আধুনিক মানস এই পদ্ধতিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেন এবং নিজের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বশক্তি দিয়ে এই দুরহ কাজে আত্মনিরোগ করেন। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর পরিণত ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বয়সে রচিত ও প্রকাশিত “বেলায়তে মোত্লাকা” মাইজভাণ্ডারী প্রকরণের আকরণস্থ-এই লক্ষ্য এবং সাধনারই ফলশ্রুতি। এই গ্রন্থটাকে বাংলায় ‘সার্বজনীন রহানী নৈকট্য প্রক্রিয়া’ নামে অভিহিত করা যায়। এই গ্রন্থে মানুষের জৈবিক, পার্থিব, অপার্থিব, সাংস্কৃতিক, কাঞ্জিত প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-আচার-সংস্কৃতিগত পার্থক্য নির্বিশেষে কাঞ্জিত সর্বমানবিক কল্যাণগুরু ঐক্যবিধানের প্রয়াসের নির্দেশনা সন্ধান পাওয়া যায়; যা চিন্তা ও কর্মের জগতে নতুন নতুন ফসলী ক্ষেত্রের প্রস্তুত ঘটাতে সক্ষম। এই গ্রন্থ মূলতঃ একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যসম্পন্ন দার্শনিক, সমাজ-বিজ্ঞান ও মৌলিক অধ্যাত্ম চর্চার পরামর্শমূলক গ্রন্থ; নিরেট কোন ধর্মীয় কিম্বা ধর্মাচার বিষয়ক পত্রক নয়। বরং বলা যায়, বাস্তব

নির্দেশক গ্রন্থ।

৩. মাইজভাণ্ডারী প্রকরণ

(maizbhandari methodology):

প্রথমেই আমরা methodology-র অর্থ দেখি। এই শব্দটার বাংলা অর্থ নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা বা কোন কাজে ব্যবহৃত নিয়ম বা পদ্ধতিসমূহ (বাংলা একাডেমী: ইংরেজী-বাংলা অভিধান)। অক্সফোর্ড অভিধান মতে “A set of methods and principles used to perform a particular activity” (নির্দিষ্ট কোন কর্ম সম্পাদনে ব্যবহৃত এক প্রস্ত পদ্ধতি ও নীতিমালা)।

এই সংজ্ঞার আলোকে আমরা মাইজভাণ্ডারী প্রকরণ অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে হাতের কাছে একমাত্র যে গ্রন্থটা পাই, তাহলো ‘বেলায়তে মোত্লাক’। এ প্রসঙ্গে আমরা মানব সভ্যতার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক স্তর সক্রিটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি: পৃ:), প্লাটো (৪২৮/৪২৭-৩৪৭/খ্রি: পৃ:) এবং এ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি: পৃ.) বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের কথা স্মরণ করতে পারি (তাঁরা তিনজন আরবী সাহিত্যে যথাক্রমে সাক্ষাত, আফগানুন এবং আরাস্ত উচ্চারণে লিখিত)। সক্রিটিসের মুখ থেকে শ্রুত ও সংগৃহীত উকিলগুলো গ্রাহকারে সন্নিবেশিত করেন প্লাটো তাঁর বিখ্যাত ‘ডায়লগ’ গ্রন্থে। এ্যারিস্টটল প্লাটোর রচনা ও শিক্ষার বীজতলা থেকে রাষ্ট্র, দর্শন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত ফসলের উত্তোলন ঘটান। হ্যারত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) ছিলেন মহান শিক্ষক ও দার্শনিক, যার শিক্ষকতা পেশাদারিত্ব ছিলিয়ে দার্শনিক ও রূহানী স্তরে প্রসারিত হয়ে আছে। আমরা এক্ষেত্রে হ্যারত আকদাসের ব্যাপারে যুগপৎ শিক্ষক ও দার্শনিক শব্দব্যবহার করেছি। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকঅ্য দর্শন-রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করে গেছেন। হ্যারত সাহেবে কেবল তাঁর পূর্ববর্তী গ্রীক-ইসলামী/মুসলিম এবং পরবর্তীতে বিকশিত দর্শনের বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমিকায় সমকালীন সক্রিটিস ক্লপে আবির্ভূত হয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ভূবনে কার্যকর শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি লিখিত কিছু রেখে গেছেন বলে জানা যায় না। তাঁর শিক্ষার লিপিকার প্লাটোর অনুরূপ হ্যারত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং)। তবে এই ভাগ্যবান লিপিকারের সুবিধা ছিল এই যে, তিনি জন্মের পর (১৮৯৩ইং) থেকে তেরো বছর তাঁর দাদাজানের প্রত্যক্ষ স্নেহ, ছত্র ও শিক্ষা ছায়ায় থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হ্যারত আকদাসের ওফাত হ্যার

১৯০৬ইং। ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয় যে, অছিয়ে গাউসুল সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি-তর্কের জালে আটকে পড়ে আয়ম তাঁর ১৮ বছর বয়সে ১৯১১ সনে মোহসেনিয়া মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যাগুলোকে আলোচ্যসূচী থেকে মাদ্রাসার কৃতি ছাত্র ছিলেন। অতএব, তাঁর দাদাজান প্রায় বাদ দিতে বসেছিলেন; সে সময়ে তিনি ‘দর্শন ও সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং এর সঙ্গে ছিল বিজ্ঞানের সত্য’ এবং ‘ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্য’ তত্ত্বের পতন পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নত শিক্ষা। কিছু পড়ে, জেনে, করেন, যাতে বলা হয় যে, ধর্মের (বিশেষ করে ইসলাম) এবং শুনে আত্মস্থ করা এবং বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে উপর্যুক্ত দর্শনের মৌলিক সত্যগুলো অভিন্ন। ধর্ম (মৌলিক, তাত্ত্বিক, পয়েন্ট বের করে আনার দক্ষতা ও জ্ঞান যে তাঁর মতো ব্যবহারিক) কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক ব্রতের মধ্যে সীমিত নয়, মানুষদের অন্তর্জাত, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেন। অতএব, সার্বজনীন এবং তাই অপরিহার্যভাবে সর্বস্তরের গণমানুষের হ্যারত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কং) চেতনা, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তার পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। ‘কাজেই ‘ধর্ম’ হচ্ছে জনগণের কর্ম পরিক্রমাকে লিখিত আকারে পুস্তকে বিন্যস্ত করার দায়িত্ব জন্য এক ধরনের দর্শন’, যা দুর্বোধ্য নৈর্ব্যক্তিক ভাষায় সত্যের যথোপর্যুক্ত প্রতিভার উপরই অর্পিত হয়েছিল এবং তা তিনি প্রকাশ না ঘটিয়ে বরং সর্বসাধারণের সহজবোধ্য দৃষ্টান্তসমূহ সফলভাবে পালন করেছিলেন প্রায় ২২ শত বছর পূর্বের উপদেশপূর্ণ হিতকথারূপে বিবৃত হয়। বলাবাহ্য্য, এক্ষেত্রে প্লাটোর মতোই। তিনি তাঁর দাদাকে দেখেছেন, শুনেছেন, কুরআনের অবস্থান সর্বোচ্চে।

অনুভব করেছেন, অনুধাবন করেছেন এবং সেসব আবার সর্বইবনে সিনার এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দার্শনিক আবু সাধারণের কল্যাণার্থে সহজ ভাষায় প্রকাশ করে একাধারে রূপদের (১১২৬-১১৯৮খ্রি:) বিখ্যাত, কিন্তু এক শ্রেণীর দার্শনিক, ধর্ম ও সমাজসেবকসূলভ দায়িত্ব পালন করে মুসলিম ও খ্রিস্টান গোড়াপস্থীদের দ্বারা তীব্র বিতর্কিত ‘দৈত সত্যের’ (ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্য এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য) তত্ত্ব এবং এর ধারাবাহিকতায় বিপরীতক্রমে সেইন্ট টমাস হ্যাকুলানাসের (১২২৭-১২৭৪ খ্রি:) ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে এখানে ‘দার্শনিক’ শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে কিঞ্চিৎসমন্বয়ী দর্শন নির্মাণের প্রয়াসের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, যা আলোকপাত করা দরকার। অন্তর্গত তাগিদে যথার্থ জ্ঞানের ধর্ম-দর্শন-রাষ্ট্র-যাজক সমাজ-লোক সমাজের প্রগতিশীল অন্বেষকই দার্শনিক। কি ছিল, কি আছে, কি হবে বা হওয়াবিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ গড়ে তুলেছে। অবশ্য কুরআনে উচিত-এসব নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে চিন্তা-ভাবনা-কল্পনার বিজ্ঞান, যুক্তি ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধের অবকাশ রাখা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে উভের খোঝাই তাঁদের নেশা। হয়নি অকাট্য যুক্তিসহকারেই। উপরন্তু মহাসৃষ্টির উত্তোলন, তাঁদের উপরোক্ত ‘কি’-গুলো আবার প্রকৃতি, সমাজ, ধর্ম, বিকাশ, বিবর্তন, গতিশীলতা এবং পরিবর্তনজাত রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সংকীর্তন, লোকিক-আলোকিক সর্বক্ষেত্রে অবিনশ্বরতার এক ধারাবাহিক সহজবোধ্য যুক্তিসিদ্ধ বিবরণ বিচরণশীল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে একজন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, ইউরোপ মাত্র দার্শনিক বিবাজ করে। মানুষ জন্মগতভাবেই ‘সু’ এবং ‘কু’ দুশ্শো/আড়াইশো বছর আগ পর্যন্ত কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও ‘ভালো’ এবং ‘মন্দ ‘উচিত্য’ এবং ‘অনৌচিত্য’ সম্পর্কে বার্তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত না থাকায় বিভাস্তি সৃষ্টি হয়, যা একটা ধারণা নিয়ে জন্মায়;- যেগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষে প্রাবল্য এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান-গবেষণার বিস্তারের ফলে কেটে যাচ্ছে। তার কর্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। ‘ধর্ম’ অতএব, স্বীকৃত দার্শনিক সূত্রমতেই হ্যারত গাউসুল আয়ম হিসেবে বিবেচিত বিষয়টা ‘কু’ কে নিয়ন্ত্রিত বা দমন করে, মাইজভাণ্ডারী (কং)সহ তাঁর পূর্বের কুরআনের মুক্তি-তর্কের মহান লোক-শিক্ষক ‘সু’-কে লালন ও পরিচর্যা করে। দার্শনিকদের এই ধারা এবং লোক-শিক্ষক ওলী আল্লাহদেরকে একাধারে ধর্মগুরু, অব্যাহতভাবে চলমান, যেমন অব্যাহত বিজ্ঞানীদের ধারা। শিক্ষাগুরু ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা যায়।

হাজার বছর ধরে শান্তি যুক্তি-তর্কের অপারেশন থায়েটারে হ্যারত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং) এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নবী-রসূলগণকে দার্শনিকের মর্যাদা দেন মানুষ শিক্ষক ও দার্শনিকের চিন্তা- চেতনা-কল্যাণ কর্মের প্রাচ-প্রাচাতের জ্ঞানের করিডোর বিজ্ঞান-দার্শনিক ইবনে বরিল ফুল-ফসলে ভরা বিশাল উদ্যানে বিচরণ ও হিতকরী সিনা (১৮০-১০৩৭ খ্রি:)। যুগপৎ মুসলিম ও খ্রিস্টান ফসল তোলার পদ্ধতিকরণ করেছেন। এই দুরহ কর্ম সম্পাদন জগতের ধর্মীয় পত্রিত ও দার্শনিকরা মানুষের বোধাতীত করতে গিয়ে ‘বেলায়তে মোত্লাক’ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে

অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলেছেন: “আমার পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ দাদাজান, ওলীকূল শিরোমণি সুফি সন্মাট গাউসুল আয়ম জনাব শাহসুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কং)-যাহার মহান জীবনাদর্শ আমাকে ‘বেলায়তে মোত্লাক’ লিখারূপে কঠিন কাজে অনুপ্রাপ্তি করিয়াছে....।” অতএব, স্থতসিদ্ধভাবে উপসংহারে আসা যায় যে, এই গ্রন্থে হ্যারত আকদাসের জীবনাদর্শ বর্ণিত, বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং এটা মাইজভাণ্ডারী মেথডলজিজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এই মাইজভাণ্ডারী দার্শনিক আকরণহুলে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ১৫টি পরিচ্ছেদে ৭৪টি উপশিরোনামে সংক্ষিপ্ত অথচ সহজবোধ্য (comprehensive) আকারে পরিবেশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, নবুত্ত, রেসালাত, বেলায়ত, হেদায়ত, সুফি সভ্যতা, শরিয়ত-ত্বরিকত-মারিফত-হাকিকত, অধ্যাত্ম সঙ্গীত, নামায-রোজা-হজ্জ-যাকাত, হালাল-হারাম, এমনকি তৌহিদ আদ্যান, আদলে মোতলক (সার্বজনীন বিচারসাম্য) প্রভৃতি মুসলিম তথ্য মানবজীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তব ও রাহানী বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সুফি চেতনা বা কল্যাণ ও পরিব্রাতার চেতনা মানুষের জন্মগত। সামাজিক পরিবেশে এই চেতনার বিকাশের পটভূমির উপরও এই পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. সুফিবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ [হ্যারত হাসান বসরী (রঃ)]

থেকে হ্যারত ইবনুল আরাবী (রঃ):
মুসলিম ইতিহাসে প্রতিষ্ঠানগতভাবে সুফিবাদের সুবিশাল পটভূমিসম্পন্ন বিকাশ ও অস্তুর্ভুক্ত ঘটে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে নবীজীর (দঃ) ও ফাতের তিনি শতাধিক বছর পরে। আকবারীয় শাসন আদলে সুফিবাদ একটি তত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয় আকর্ষণীয় আচারপদ্ধতিরূপে বিকশিত হতে থাকে (সময়টা অষ্টম শতাব্দীর শেষে তথ্য থেকে নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ধরা যেতে পারে)। অবশ্য এর আগে হ্যারত হাসান বসরী (রঃ) [মৃত্যু ৭২৮ খ্রি:] হ্যারত আবু হাসিম (মৃত্যু ৭৭৮ খ্রি:) হ্যারত জাবীর বিন হায়ান (মৃত্যু ৭০০ খ্�রি:), হ্যারত রাবেয়া বসরী (রঃ) [মৃত্যু ৭৭৬ খ্রি:] প্রমুখকে প্রাথমিক পর্যায়ের সুফি হিসেবে মান্য করা হয়, যদিও আরবী কিম্বা ফার্সি কোন সাহিত্যেই ঐ সময়ে সুফি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। হ্যারত জুন্মুন মিসরী (রঃ) [মৃত্যু ৮৬০ খ্রি:], হ্যারত বায়েজিন বোতামী (রঃ) [মৃত্যু ৮৭৪ খ্রি:], হ্যারত মনসুর হাল্লাজ (রঃ) [মৃত্যু ৯২২ খ্রি:] প্রমুখের সময়ে সুফিবাদের বিবরণের দ্বিতীয়

পর্যায় শুরু হয়। হ্যরত জুননুন মিসরীর (রঃ) মতবাদকে লিপিবদ্ধ, বিন্যস্ত ও সুসংহত করেন হ্যরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) [মৃত্যু ১১০ খ্রি:]। হ্যরত জুননুন সর্বখোদাবাদী বা pantheist ছিলেন না। এই সুফি-দার্শনিক ‘হাল’-কে খোদা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেন এবং ‘হাল ও মকাম’ বা ‘তন্মুঠাত ও স্তর’ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করেন। হ্যরত বায়েজিদ (রঃ) এবং হ্যরত মনসুর হাস্তাজ (রঃ) সুফি ধারণাকে সর্বখোদাবাদের দিকে (pantheism) নিয়ে যান, যা হ্যরত ইবনুল আরাবীর (রঃ) [মৃত্যু ১২৪০ খ্রি:] হাতে প্রগলীবদ্ধ মতবাদ হিসেবে গড়ে উঠে। তিনি ‘বহু এবং এক’-এর মধ্যে পার্থক্য ও অভিন্নতার সুপ্রাচীন সূত্র ধরে গাণিতিক পদ্ধতিতে ‘তৌহিদে আবীয়ান’-তত্ত্বে উপনীত হন, যা বাংলা ভাষায় সহজে এভাবে বলা যায়, “সকল উপাসনাই স্ট্রষ্টার উপর বিশ্঵াস সম্পর্কীয়। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আচারগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, সবই এক সার্বজনীন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।” সহস্রাধিক বছর ধরে ইউরোপ-এশিয়ার মরমী জগতে প্রবল প্রভাব বিস্তারকারী, আয় পাঁচশত পুস্তক প্রণেতা, মহাপণ্ডিত অতীন্দ্রিয়বাদী এই দার্শনিকের মতে “সর্বখোদাবাদ ও একত্ববাদের মধ্যে পার্থক্যটা ‘নেয়ায়িক’ বা তার্কিক (logical) সত্য।” তাঁর মতে, “সম্ভব বিশ্বজগৎ একটি সার্বিক আত্মা, যা মানব মনের চেয়ে উন্নত এর ঐক্যের নির্দেশক। কাজেই স্ট্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন। তবে যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়, তা হলো প্রত্যেক বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তা সত্তা (real) নয়। সত্তার বিশ্বমাত্র। এক সাধারণ সর্বব্যাপক গুণ সবকলপকে অতিক্রম করছে। সব বৈশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বহুর দুটো দিক: ‘বহু’ পরম্পর পৃথক এবং ‘এক’ থেকেও পৃথক। আবার ‘বহু’ পরম্পর অভিন্ন এবং ‘এক’-এর সঙ্গেও অভিন্ন। প্রথমটা পার্থক্যের দিক, দ্বিতীয়টা অভিন্নতার দিক। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বাস্তব পার্থিব জগতে আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐক্যবোধের ধারণাও সঞ্চারিত হতে পারে দার্শনিকভাবে। তবে বিষয়টা যেমন সূক্ষ্ম, তেমন জটিল গাণিতিক রসায়ন ও তার্কিকতা মণ্ডিত। vide: An Introduction to Islamic Philosophy: Prof. S. Rahman, 1951; মুসলিম দর্শনের ভূমিকা: ফেসলের রশীদুল আলম, ২য় সংস্করণ (১৯৭৩)। তবে বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের সাপেক্ষ অস্তিত্বের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে পেলে হেতুভাষের (fallacy) প্রয়োগ হওয়া প্রায় হবে।

‘বেলায়তে মোতলাকার’ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আদলে-মোত্তক বা সর্বজনীন বিচারসাম্য, সুশাসন, রবুবিয়াত বা প্রষ্টার পালনবাদী প্রকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মানব সমাজ গত এক সহস্রাধিক বছর ধরে এক জায়গায় বসে নেই। এগিয়ে যাচ্ছে মানুষের চাহিদা, সমস্যা জটিল হচ্ছে ও বাড়ছে। বিশ্ব মানব সমাজ পরম্পরার নিকটবর্তী হচ্ছে ব্যবহারিকভাবে। বিশ্বে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর আছে। কল্যাণকারী চিত্তগুলো দিন দিন সংগঠিত হচ্ছে। তবে কল্যাণময়তার এই মিহিলে আল কুরআন ও নবীজীর (দঃ) শিক্ষা ও যাবতীয় মূলনীতি অপরিবর্তিত থেকেই তুলনামূলকভাবে শ্রেয়তর নিশ্চিত কল্যাণের পথ নির্দেশ করে চলেছেন। ‘বেলায়তে মোতলাকার’ বিংশ শতাব্দী উত্তর আধুনিক মানব কল্যাণ চেতনা বাঞ্ছয় হয়ে উঠেছে এবং বাঙালি জাতি, বাংলাদেশী রাষ্ট্রসভা, মুসলিম বিশ্ব তথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে পারস্পরিক ভারসাম্যমূলক কল্যাণের পথে আহ্বান করছে, যা আল-কুরআন ও নবীজীর (দঃ) শিক্ষা ও চেতনার মর্মবাণী।

হয়রত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (কঃ) এই অতি সাধনা সাপেক্ষ মূল্যবান গ্রন্থটা রচনার সময় একথা সচেতনভাবে মনে রেখেছেন যে, তিনি বিংশ শতাব্দীরই একজন নাগরিক। বর্তমানকেই ধারণ ও প্রক্ষেপণ করতে হবে তাঁকে। অতীত থেকে তিনি বিদ্যা আহরণ করবেন, কিন্তু অতীতের বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তাঁর পদ-বিক্ষেপ ও দৃষ্টি অনাগত আলোকিত সম্মুখের দিকে এবং তিনি নিঃসঙ্কোচে এগিয়েছেন তাঁর মহান শিক্ষক ও দিশারী দাদাজানের হাত ধরে। এই আলোয় চলার জন্য ডাক দেন সবাইকে।

মসনবীয়ে মৌলবীয়ে মানবী

বিশ্ব সুফি সাহিত্যের কিংবদন্তি
মাওলানা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রঞ্জি (১২০৭-১২৭৫)

মসনবীয়ে মৌলবীয়ে মানবী
হাত্ত কুরআন দর জবানে পাহলবী
থা ইরানী ভাষায় যাঁর ‘মসনবী শরিফ’কে বলা হচ্ছে
র সাহিত্য সুফি সাহিত্যের গভীর পেড়িয়ে চিরায়ত।
সাহিত্যেও স্থান করে নিয়েছে অবলীলাকুমো
ইউনেস্কো কর্তৃক ২০০৭ সালকে ‘আন্তর্জাতিক
বাষণা, যার বাস্তব প্রতিফলন; বিশ্ব সুফি সাহিত্যের
সমকাল এবং আগামী প্রজন্মের সুফিসাহিত্যের
দ্রবতারা মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমি সম্পর্কে
ধ্বাবণা নেওয়ার প্রয়োজনে।

ବାଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ମୁହାମ୍ମଦ ବାଲଥୀ ।
‘ବାଲାନା’ ‘ମାବାଲାନା’ ମୌଳଭୀ ।

খেল অথবা বাল্খ, খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্য।

বছর ১২৭৩ (৬৫-৬৬ বছর) কোনিয়া, রংপুর

[View Details](#)

ইসলাম, সুফিবাদ, তাঁর অনুগামিগণ মৌলভী
সবগুলো করেন।

সুফি সাহিত্য, হানাফী আইনশাস্ত্র
ধারণা: সুফি উপাবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ
জাজ: মসনবি শরীফ, দেওয়ান-এ-শামস-এ-
কামিয়া হিন্দি।

卷之三

দল মুহাম্মদ রূমি (ফার্সি:) ১২০৭ ১৭ ডিসেম্বর
বর্থবা পরিচিত আছেন জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ
ওলানা রূমি, যৌলভি রূমি নামে তবে শুধু মাত্র
ম বেশি জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন ১৩ শতকের
সি সুন্নি মুসলিম কবি, আইনজ্ঞ, ইসলামি ব্যক্তিত্ব
যোগী, বৈজ্ঞানিক এবং পণ্ডিত।

অতান্ত্রিকাদা, সুফ |
ভ্যতায় তাঁর প্রভাব
ব সীমানা এবং জাতি ছাড়িয়ে গিয়েছে: ফার্সি

তাজাকিস্তানী, তুর্কি, গ্রীক, পাঞ্চন, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলামানরা গত সাত দশক ধরে বেশ ভালভাবেই তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নয়নকারকে যথাযথভাবে সমাদৃত করেন।

ଅନ୍ବାଦ ବିଶେ ମାଓଲାନା କୁମିଳ

ତୀର କବିତା ସାରାବିଶେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଯ ଅନୁବାଦ କରା ହେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରା ହେଲେ ରୁମିକେ ଯୁକ୍ତାନ୍ତ୍ରର “ସବଚେଯେ ଜନପରିଯ କବି” ଏବଂ “ବେସ୍ଟ ସେଲିଂ ପାର୍ଟ୍ୟୁଟ୍” ବଲା ହେଲା ।

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

ରୁମିର କାଜ ବେଶିରଭାଗଟି ଫାର୍ସି ଭାଷାଯ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ମାଝେମଧେ
ତିନି ସ୍ଵବକଣ୍ଠଲୋତେ ତୁର୍କି, ଆରବି ଏବଂ ଗ୍ରୀକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର
କରେଛେ । ତାଙ୍କ ଲେଖା “ମସନ୍ଦୀ” କେ ଫାର୍ସି ଭାଷାଯ ଲେଖା
ସବଚେଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବେ ତୁଳନା କରା ହୈ । ଏଥିନା ତାଙ୍କ
ଲେଖାମୟୁକ୍ତେ ମୂଳ ଭାଷାଯ ବ୍ୟାପକଭାବେ ପଡ଼ା ହୈ ଇରାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
ଏବଂ ବିଶେଷ ଫାର୍ସି ଭାଷାର ଲୋକେରୋ । ଅନୁବାଦମୟୁହିତ ଖୁବ
ଜନପିତ୍ୟ, ବିଶେଷ କରେ ତୁର୍କି, ଆଜାରବାଇଜାନ, ମୁଜରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ

ଦକ୍ଷିଣ ଏଶ୍ୟାଯ় ।

অন্যান্য সাহিত্যের উপর প্রভাব
তাঁর কবিতা ফার্সি সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে, শুধু তাই নয়
তুর্কি সাহিত্য, উসমানীয় তুর্কি সাহিত্য, আজারবাইজান
সাহিত্য, পাঞ্জাবের কবিতা, হিন্দী সাহিত্য, উর্দ্ধ সাহিত্যকেও
অনেক প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও অন্যান্য ভাষার সাহিত্য
যেমন তুর্কিচ, ইরানী, ইন্দো-আর্য, চাগাতাই, পাশতো এবং

বাংলা সাহিত্য ও

নামের বহুমাত্রিকতা
তাঁকে ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি ডাকা হয় “রুমি” নামে
তাঁর পুরো নাম “জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ বালখী” বা
“জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ রুমি”। বালখী এবং রুম দুটো তাঁর
জাতিগত নাম অর্থাৎ “বালখু” থেকে এবং “রুম” থেকে (রুম
আনাতোলিয়ার ফার্সি এবং তুর্কি নাম) যথাক্রমে। রুমির
মিওরযোগ্য জীবনী লেখক ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এর
ফ্রাঙ্কলিন লুইস এর মতে আনাতোলিয়া উপনীপ ছিল
বাইজেন্টাইন বা রুম স্বাধারের অন্তর্গত যেটি পরবর্তীতে
তুর্কির মসলিমদের দখলে আসে যেটি এখন পর্যন্ত আরব

পারস্য এবং তুর্ক নামে পরিচিত, যেটি ছিল রূম এর ভৌগলিক এলাকা। যেখানে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন, রূমি ছিলেন তাদেরই একজন।

“রূমি” শব্দটি মূলত আরবিক যার অর্থ রোমান। তবে তিনি ব্যাপকভাবে তাঁর উপনাম “মাওলানা” নামে পরিচিত। মাওলানা একটি আরবিক শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ‘শিক্ষক’।

জীবন কথা

রূমি জন্মগ্রহণ করেন স্থানীয় ফার্সি ভাষী মাতৃপিতার কাছে, যারা মূলত বালখ এর বাসিন্দা যা বর্তমানে আফগানিস্তান। তিনি হয় ওয়ালখস যা বৃহৎ বালখ স্বার্গের বালখস নদীর কাছে একটি গ্রাম যেটি বর্তমানে তাজাকিস্তান, অথবা তিনি বালখ শহরে বর্তমান আফগানিস্তান এ জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎ বালখ তখন ছিল ফার্সি সংস্কৃতি সূফী চর্চার মধ্যবিন্দু। যেটি বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁর উপর যাঁদের প্রভাব

রূমির পিতা ছাড়াও রূমির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছেন তখনকার ফার্সি কবি আন্তার এবং সানাই রূমি তাঁদের গুণগ্রাহিতা করেছেন।

“আন্তার হচ্ছে আআ, সানাই হচ্ছেন তাঁর দুঁচোখ, এবং সময় এরপরে, আমরা তাঁদের ট্রেনে ছিলাম” এবং আরেকটি কবিতাতে স্মৃতিচারণ করেছেন “আন্তার ভালবাসার সাতটি নগরই ভ্রমন করেছেন আর আমি এখনও একটি গলির প্রাণে অবস্থান করছি”। তাঁর পৈতৃক দিক থেকে তিনি নাজিম উদ্দিন কুবরা এর বংশধর ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ

সময় রূম সালাতানাত এর পারশ্যতে কাটিয়েছেন। যেখানে তিনি তাঁর কাজ রচিত করেছেন এবং ১২৭৩ ঈসাবীতে ইস্তিকাল করেছেন। তাঁকে কোনিয়ায় সমাহিত করা হয় এবং সেটি এখন একটি তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। রূমির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সুলতান ওয়ালাদ এবং তাঁর অনুসারীরা “মৌলভী রূমি” স্থাপন করে, এটিকে ঘৃণ্যমান দরবেশে বলা হয়, যেটি সুফি ন্তো সামা” এর জন্য বিখ্যাত। তাঁকে তাঁর পিতার কাছে শায়িত করা হয় এবং তাঁর দেহাবশেষ এ একটি জমকাল দরগাহ নির্মাণ করা হয়। শামস উদ্দিন আহমদ আফলাকী এবং “মানকিব উল-আরিফিন”(১৩১৮ এবং ১৩৫৩ এর মধ্যে লেখা)তে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থকে অত্যন্ত মূল্যবান বলা হয় কারণ এতে রূমি সম্পর্কে কিংবদন্তী এবং সত্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এর প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন লুইস এর লেখা রূমি এর জীবনী গ্রন্থে এটা সম্পর্কে আলাদা একটি অধ্যায় রয়েছে।

পিতার পরিচয়

রূমির পিতা বাহা উদ্দিন ওয়ালাদ ছিলেন বালখ এর একজন ভাই উভয়েই সেখানে মারা যায়।

ধর্মতাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ এবং একজন অতীন্দ্রিয়ানী। যিনি রূমি পারিবারিক রূমি

এর অনুসারীদের কাছে “সুলতান আল-উলামা” নামে ১২২৫ সালে, কারামানে রূমি বিবাহ করেন গওহর খাতুন পরিচিত। সবচেয়ে জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থ লেখকদের মতে তিনি কে। তাঁদের দুটো ছেলেও সুলতাম ওয়ালাদ এবং আলাউদ্দিন ছিলেন খীলী আবু বকর আলাইহিস সালাম উনার বংশধর, চালাবী। যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান রূমি পুনরায় বিবাহ করেন যদিও আধুনিক গবেষক-পণ্ডিতরা সেটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং তাঁর এক ছেলে, আমির আলিম চালাবী ও এক মেয়ে মায়ের দিক থেকে খোয়ারিজমীয় বংশধর দাবি করা হয়েছিল মালাখী খাতুন।

রাজবংশের সাথে যুক্ত করার জন্য কিন্তু এ দাবি প্রত্যাখ্যান শিক্ষা

করা হয় কালামুক্রিমিক এবং ঐতিহাসিক কারণে। সবচেয়ে ১২২৮ সালের ১ মে, আনাতোলিয়া শাসক আলাউদ্দিন সম্পূর্ণ বংশতালিকা করা হয়েছে তাঁর পরিবারের যা ছয় কায়কোবাদ তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানান, বাহা উদ্দিন থেকে সাত প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত যেটি যুক্ত হয়েছে হানাফী আনাতোলিয়া আসেন এবং আনাতোলিয়া এর কোনিয়াতে ফকীহগ্রন্থের সাথে। আমরা বাহা উদ্দিন এর মায়ের দিকে চিরস্থানীয়ভাবে বসবাস শুরু করেন যেটি রূম সালাতানাত এর থেকে নামের উৎস জানতে পারিনা, কিন্তু শুধুমাত্র তিনি তাঁকে পশ্চিমাঞ্চল। বাহা উদ্দিন মদ্রাসা এর প্রধান শিক্ষক হন এবং “মামি” (ফার্সি ভাষায় মা এর চলিতরূপ) বলে উল্লেখ্যখন তিনি মারা যান রূমির বয়স পঁচিশ বছর, করেছেন এবং তিনি ছিলেন খুবই সাধারণ একজন মহিলা উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি তাঁর পিতার পদ পান একজন যিনি ১৩ শতকে বাস করেছেন। রূমি এর মা ছিলেন মুইমিনা ইসলামিক মৌলভি হিসাবে। বাহা উদ্দিন এর একজন ছাত্র, খাতুন। তাঁর পারিবারিক কাজ ছিল কয়েক প্রজন্ম ধরে সৈয়দ বুরহান উদ্দিন মোহাম্মদ তাঁরমিয়ি, রূমিকে শরীয়াহ ইসলাম ধর্মের হানাফী মাজহাবের প্রচারণা করা এবং এবং তাঁর সম্পর্কে শিক্ষা দিতে থাকেন বিশেষ করে তাঁর পরিবারের এই ঐতিহ্যকে রূমি এবং সুলতান ওয়ালাদের দিকগুলো। নয় বছর ধরে তিনি সূফীবাদ শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছেন। যখন মঙ্গল মধ্য এশিয়া দ্বারা আক্রান্ত করেন বুরহান উদ্দিন এর শিষ্য হিসাবে যতদিন না তিনি মারা ১২১৫ এবং ১২২০ সাল এর মধ্যে, বাহা উদ্দিন ওয়ালাদ তাঁর যান ১২৪০ বা ১২৪১ সালে। এরপর রূমির জনজীবন শুরু পুরো পরিবার এবং একদল শিষ্য সহ পশ্চিমাঞ্চলে রওনাহয়ঃ তিনি একজন ইসলামী ফকিহ বা আইনজ্ঞ হন, ফতওয়া হন। ঐতিহাসিকদের মতে যেটি রূমির শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশ করেন এবং কোনিয়ার মসজিদে নেতৃত্বে বৃক্ষতা দিতে থাকেন। তিনি মদ্রাসাতে একজন মৌলভি হিসাবে কাজ দিতে থাকেন। তিনি মদ্রাসাতে একজন মৌলভি হিসাবে কাজ দিতে থাকেন এবং তাঁর অনুগামীদের শিক্ষা দেন। এই সময়কালে করেন এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যান এবং তাঁর পুরো পরিবার এবং একদল শিষ্য সহ পশ্চিমাঞ্চলে রওনাহয়ঃ তিনি একজন ইসলামী ফকিহ বা আইনজ্ঞ হন, ফতওয়া হন। ঐতিহাসিকদের মতে যেটি রূমির শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশ করেন এবং কোনিয়ার মসজিদে নেতৃত্বে বৃক্ষতা দিতে থাকেন। তাঁর আপনার কাজ থেকে দুর্দান্ত করবে এবং সংগীত রচনা করবে এটিতে সহবর্তমান থাকতে। রূমি মুচকি হাসলেন এবং এক টুকরো কাগজ বের করে তাঁর “মসনবী” এর প্রথম অংশে লাইন লিখলেন, মসনবীর প্রথম ১৮ লাইন

“বাঁশের বাঁশি যখন বাজে, তখন তোমরা মন দিয়া শোন, সে কী বলে, করেন এবং তাঁর অনুগামীদের শিক্ষা দেন। এই সময়কালে আন্তার এর দেখা হয় ইরানিয়ান শহর “নিশাপুর” এ। আন্তার চার বছর অতিবাহিত করেন।

সাথেসাথেই রূমির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য চিনতে পেরেছিলেন। তাসাওউফের শাম্স তাবরিজীর সোহবতপ্রাণ্ত

তিনি দেখতে পেলেন রূমি তাঁর পিতার পিছনে হেঁটে যাচ্ছেন দরবেশ শামস তাবরিজী এর সাথে সাক্ষাৎ হয় ১৫ নভেম্বর এবং বললেন, “একটি হৃদের পিছনে একটি সমুদ্র যাচ্ছে”। ১২৪৮ সালে যেটি তাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়। তিনি বালককে একটি বই প্রদান করলেন “আসরারনামা” একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষক এবং আইনজ্ঞ থেকে রূমি একজন নামে যেটি ইহজগতে আত্মাকে জড়িয়ে ফেলা সম্ভব। এই সুফি সাধকে রূপান্তরিত হন। শামস মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র ভ্রমণ সাক্ষাত আঠার বছরের রূমির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে করে খুঁজছেন এবং বলেছেন “কে আমার সঙ্গ সহ্য করিবে”। এবং পরবর্তিতে তাঁর কাজের উৎসাহ হিসাবে কাজ করেছে। একটি কষ্ট তাঁকে বলিল, “বিনিময়ে তুমি কি দিবে?” শামস নিশাপুর থেকে ওয়ালাদ এবং তাঁর লোকজন বাগদাদ এর উত্তরে দিলেন, “আমার শির!!”

দিকে রওনা হন এবং অনেক পাণ্ডিত ও সুফীদের সাথে সাক্ষাত কর্তৃতি আবার বলল, “তাহলে তুমি যাকে খুঁজছ সে কোনিয়ার কাজে রেখে রওনা হন এবং জালাল উদ্দিন”। ১২৪৮ সালের ৫ ডিসেম্বর রাতে রূমি এবং মকায় হজ পালন করেন। এরপর অভিযান্ত্রী কাফেলার দলটি শামস কথা বলছিলেন, এমন সময় কেউ শামসকে পিছনের দামেক, মালাত্যেয়া, এরজিকান, শিবাস, কায়সেরি এবং দরজায় ডাকে। তিনি বের হয়ে যান এবং এরপর আর নিগদি পাড়ি দেয়।

এরপর তাঁরা কারামান এ সাত বছর থাকে। রূমির মা এবং পুত্র আলাউদ্দিন এর মৌনসম্মতিতে শামসকে হত্যা করা হয়,

যদি তাই হয় তাহলে শামস এই রহস্যময় বন্ধুত্বের জন্য তাঁর মাথা দিয়েছেন।

দেওয়ানে শাম্স তাবরিজী রচনার প্রেক্ষাপট

শামস এর জন্য রূমির ভালবাসা এবং তাঁর মৃত্যুতে শোকের প্রকাশ তিনি করেছেন “দেওয়ান-এ শামস-এ তাবরিজী” কাব্যগ্রন্থে। তিনি নিজে শামসের খোঁজে বের হয়ে গেছেন এবং দামেক ভ্রমণ করেছেন। সেখানে তিনি বুঝতে পারলেন:

“আমি কেন তাকে খুঁজব?

সে আর আমি তো একই

তাঁর অস্তিত্ব আমার মাঝে বিরাজ করে

আমি নিজেকেই খুঁজছি!”

রূমি অনায়সে গজল রচনা করতে শুরু করলেন এবং সেগুলো “দেওয়ান-ই কবির” বা দেওয়ান শামস তাবরিজীতে সংগৃহীত করা হয়।

মসনবী শরিফ রচনার শানে নয়ুল

রূমি আরেকজন সঙ্গী খোঁজে পান সালা উদ্দিন-ই জারকুব, একজন স্বর্গকার। সালা উদ্দিন এর মৃত্যুর পর রূমির কেরাণী এবং প্রিয় ছাত্র হসাম-এ চালাবি রূমির সঙ্গী ভূমিকা পালন করেন। একদিন তাঁরা কোনিয়ার বাইরে একটি আঙুরক্ষেতে বিচরণ করছিলেন তখন হসাম রূমিকে একটা ধারণা বললেনঃ “যদি আপনি একটি বই লিখেন যেমন সানাই এর “এলাহিনামা” বা আন্তার এর “মাতিক উত-তাইর” এর মত, যেটি অনেকের সঙ্গ দেবে। তারা আপনার কাজ থেকে দুর্দান্ত করবে এবং সংগীত রচনা করবে এটিতে সহবর্তমান থাকতে। রূমি মুচকি হাসলেন এবং এক টুকরো কাগজ বের করে তাঁর “মসনবী” এর প্রথম অংশে লাইন লিখলেন, মসনবীর প্রথম ১৮ লাইন

“সে তাহার বিরহ বেদন্যায় অনুত্পন্ন হইয়া ক্রন্দন করিতেছে।”

হসাম রূমিকে মিনতি করতে লাগলেন আরো লিখার জন্য।

রূমি তাঁর পরের বারাটি বছর আনাতোলিয়ায় তাঁর সেরা কাজ “মসনবী” এর ছয়টি খন্দের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

ইস্তিকাল

১২৭৩ সালের ডিসেম্বর এ রূমি অসুস্থবোধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং অনেক জনপ্রিয় হওয়া একটি গজল রচনা করেন যার শুরু হয়ঃ

“কিভাবে জানব কোন ধরণের রাজা আমার মধ্যে আছে

আমার সহচর হিসাবে?

আমার উজ্জ্বল মুখে দৃষ্টি দিও না আমার বদ্ধ পাণ্ডলোর

জন্য।”

১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩ সালে রংমি কোনিয়ায় মারা যান। তাঁকে তাঁর পিতার কাছে সমাহিত করা হয় এবং যেটি একটি চমকপ্রদ ঘর।

তাংপর্যপূর্ণ সমাধি ফলক

“ইয়াসিল তুর্ব” (সবুজ সমাধি, যা বর্তমানে মাওলানা মিউজিয়াম), তাঁর কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর সমাধিফলকে লেখা: “বখন আমি মৃত, পৃথিবীতে আমার সমাধি না খুঁজে, আমাকে মানুষের হাদয়ে খুঁজে নাও।”

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণের মিলনকেন্দ্র তাঁর রওজা

জর্জিয়ার রাণী গুরসু খাতুন ছিলেন রুমির উৎসাহদাতা এবং কাছের বন্ধু। তিনি কোনিয়াতে রুমির সমাধি নির্মাণে তহবিল প্রদান করেন। ১৩ শতকের মাওলানা মিউজিয়াম সহ তাঁর মসজিদ, থাকার জায়গা, বিদ্যালয় এবং মৌলভি তরীকার অন্যান্য ব্যক্তিদের সমাধি দেখতে আজকেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম-অমুসলিমরা ছুটে যান।

অন্যান্য ধর্মের উপর তাঁর প্রভাব

জালাল উদ্দিন যিনি রুমি নামে পরিচিত, তিনি ছিলেন ইসলামের একজন দার্শনিক এবং মরমী। তাঁর উপদেশ সমর্থন করে ভালবাসার মাধ্যমে অসীম প্রমতসহিষ্ণুতা, ইতিবাচক ঝুঁকি, ধার্মিকতা, দানশীলতা এবং সচেতনতা। তিনি এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে সকল ধর্মই অধিক বা কম সত্য। মুসলিম, খৃষ্টান এবং ইহুদীকে একই দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, তাঁর শান্তিপূর্ণ এবং সহিষ্ণু শিক্ষাদান বা উপদেশ সকল ধর্মের মানুষের অন্তর স্পর্শ করেছে।

শিক্ষাদান

রুমি'র শিক্ষার সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল অন্যান্য ফার্সি সাহিত্যের মরমী এবং সুফি কবিদের মত তাওহিদ শিক্ষা। তাঁর সাধনা অর্জনের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রতিয়মান হয়ে উঠে তাঁর বই মসনবী এর নিম্নোক্ত কবিতায়:

“আমি পাথর হয়ে মরি আবার গাছ হয়ে জন্মাই

গাছ হয়ে মরি আবার পশু হয়ে জন্মাই

পশু হয়ে মরি আবার মানুষ হয়ে জন্মাই

তাহলে ভয় কীসের? কীবা হারাবার আছে মৃত্যুতে?

পরবর্তি পদক্ষপে আমি মানুষের প্রকৃতিতে মারা যাব, যাতে স্বর্গদৃতদের সাথে আমার মাথা এবং ডানা উঁচু করতে পারি,

এবং অবশ্যই স্বর্গদৃতদের নদী থেকে লাফ দিব,

সবকিছুই নশ্বর শুধুমাত্র তিনি (সৃষ্টিকর্তা) ছাড়া,

আবারও আমি স্বর্গদৃতদের মধ্য থেকে উৎস্থ হব,

আমি কি হব তা আমার কঙ্গনার বাইরে,

তারপর আমি অস্তিত্বহীন হব; অস্তিত্বহীন আমাকে বলে(সুরের

মাধ্যমে) বাঁশির ন্যায়,

প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে, যিনি একে তুলনা করেন যে সেরা অতীন্দ্রি বাদী কবিতার আমাদের সৃষ্টি করেছেন।”

মসনবীর বিষয়বস্তু

মসনবী রচিত হয় প্রতিদিনের দৃশ্য, কোরানের আয়ত এবং রুমির আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে “দেওয়ান-এ-কবির” ব্যাখ্যা, জটিল এবং বিশাল আধ্যাত্মিক থেকে। তাঁর সম্পর্কে(প্রধান কাজ) বা “দেওয়ান-এ শামস তাবরিজী”(শামস বলা হয় যে সে “একজন নবী নয় কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সে তাবরিজী এর কাজ); যেটি নামকরণ করা হয় রুমির শিক্ষক একটি ধর্মসন্দৰ্শন নিয়ে এসেছে।

রুমির একান্ত বিশ্বাস

রুমি প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্টিকর্তার কাছে ১৯টি শ্লোক আছে, এবং ন্যূত্য। রুমির দ্বিপদী তুর্কি ভাষায় এবং ১৪টি দ্বিপদী গ্রীক ভাষায়।

কাছে, সঙ্গীত সাহায্য করে সমস্ত সত্তাকে পরিব্রত করতে আলোচনা ও বক্তৃতার সংকলন

কেন্দ্রীভূত করে এবং এতই তৈরিভাবে যে, আত্মা একই সাথে ফি মা ফি। এটি একান্তরটি আলোচনা এবং বক্তৃতার সংগ্রহ ধৰ্মস এবং পুনরুদ্ধিত হয়। এই ধারণা থেকে সুফি ন্যূত্য গড়ে যেটি রুমি তাঁর ছাত্রদের দিয়েছিলেন। এটি প্রধীনত হয়েছিল উঠে। তাঁর শিক্ষা মৌলভি তুরিকার ভিত্তি হয়ে উঠে, যেটি রুমির ছাত্রদের টাকা ভাষ্য থেকে তাই রুমি এই বইয়ের তাঁর ছেলে সুলতান ওয়ালাদ পূর্ণসঙ্গে করেছিলেন। রুমি সরাসরি লেখক নন। এর ফার্সি থেকে ইংরেজি একটি অনুবাদ “সামা” এর পঞ্চপোষক, এটি সঙ্গীত শোনার মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ করেন এজে আরেবেরি “ডিসকোর্স অব রুমি” পরিভ্রান্তে নর্তন করা। মৌলভি ঐতিহ্যের মধ্যে “সামা” নামে ১৯৭২ সালে, দ্বিতীয় অনুবাদ বের করেন হাইলার প্রতিনিধিত্ব করে মন এবং ভালবাসার মাধ্যমে একের নিকট থাকসন “সাইন অব আনসিন” নামে ১৯৯৪ সালে। ‘ফি মা আধ্যাত্মিক আরোহণের এক রহস্যময় ভ্রমণ। এই ভ্রমণে ফির’ রচনার ধরণ ছিল চলিত ভাষায় এবং এটি ছিল মধ্যবিত্ত অন্বেষক প্রতিকীভাবে সত্ত্বের দিকে ফিরে, ভালবাসা বৃদ্ধি, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য।

অহং পরিত্যাগ, সত্যের সন্ধান পায় এবং নির্ভুল একের নিকট মজলিস-এ সত্তা (সাতটি সভা, ফার্সি:) এর মধ্যে সাতটি পৌছায়। এরপর অন্বেষক আধ্যাত্মিক ভ্রমণ থেকে ফেরে, ফার্সি ধর্মাপদেশে বা বক্তৃতা ছিল যেটি সাতটি ভিন্ন সমাবেশে পরিপন্থতা লাভের মাধ্যমে সৃষ্টিকে ভালবাসতে এবং সেবা দেয়া হয়েছিল। এই ধর্মাপদেশগুলো ব্যাখ্যা করে কোরানে করতে।

মসনবীর অন্য একটি স্বকে রুমি বর্ণনা করেছেন সর্বজনিন থেকে উকি রয়েছে যার মধ্যে আছে সানাই, আত্মার এবং ভালবাসার বার্তাঃ

“ভালোবাসার উদ্দেশ্য অন্য সব উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন ভালোবাসা হলো দুর্শ্রের রহস্যপুঁজ্জের জ্যেত্বির্ভিত্তি।”

রুমির প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিল “নে”(এক ধরণের বাঁশি)।

প্রধান কাজসমূহ

উসমানীয় যুগের একটি পুঁথি যেখানে রুমি এবং শামস রুমির জ্ঞানকে।

তাবরিজী সম্পর্কে চিত্রিত করা হয়।

রুমির কাব্যকে মাঝেমধ্যে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ মাকাতিব (চিঠিসমূহ, ফার্সি:) এই মধ্যে রুমির চিঠি ফার্সিতে চতুর্থপদী শ্লোক এবং গজল। গদ্যসমূহকে ভাগ করা হয় যেগুলো তিনি তাঁর ছাত্রদের, পরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য ভাবাবশালীদের কাছে দিয়েছিলেন।

চিঠিগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, রুমি বেশ ব্যস্ত ছিলেন তাঁর পরিবারে সদস্যদের সাহায্যে এবং তদারকি করেছেন তাঁর আশে পাশে বেড়ে উঠা শিষ্যদের। তাঁর পূর্বের দুটি কাজের কাজের নামাউয়ি”(আধ্যাত্মিক সাথে এটি অসদৃশ, চিঠিগুলো সজ্ঞানে বাস্তবধর্মী এবং দ্বিপদী), একটি ছয় খন্দের কবিতা। কয়েকজন সুফি এটিকে পত্রসমূহীয়, যেগুলো সাধারণত সন্ধান্ত ব্যক্তিবর্গ, কূটনীতিবিদ

বিবেচনা করেন ‘ফার্সি ভাষার কুরআন’ হিসাবে। অনেকে প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে, যিনি একে তুলনা করেন যে সেরা অতীন্দ্রি বাদী কবিতার কাজগুলোর মধ্যে একটি হিসাবে। এতে প্রায় ২৭,০০০ লাইনের ফার্সি কবিতা রয়েছে।

এবং রাজাদের কাছে লেখা।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

এটা অনন্যীকার্য যে, রুমি ছিলেন একজন মুসলিম পণ্ডিত এবং ইসলামকে তিনি গভীরভাবে নিয়েছেন। তবুও, তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা সম্প্রসারিত হয়েছে সীমিত

সাম্প্রদায়িক সংস্পর্শে। তাঁর একটি কবিতায়ঃ

“অব্যেষণকারীদের পথে জ্ঞানীমূর্তি সব একই।

তাঁর ভালোবাসায় পরিচিত-অপরিচিত সব একই।

এগিয়ে যাও! ভালোবাসায় অমৃত সুধা পান করো।

সে বিশ্বাসে, মুসলিম-পৌত্রলিঙ্ক সব একই।”

পরিত্র কোরান অনুযায়ী, হ্যরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাহু কে সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছেন সকল সৃষ্টির জন্য, যার মধ্যে সমগ্র মানবাজাতি রয়েছে। এ সম্পর্কে রুমি বলেনঃ

“মুহাম্মদের আলো কোন অগ্নিপুজারি বা ইহুদিকে পরিত্যাগ

করে না। তাঁর সৌভাগ্যের ছায়া যেন সবার উপর উজ্জ্বল হয়!

তিনি সুপথে নিয়ে আসেন যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল মরণভূমিতে।”

রুমির অনেক কবিতায় সুপারিশ করে বাহ্যিক ধর্মীয় রীতি

এবং কুরআনের প্রধান স্থানের গুরুত্বকে।

“আল্লাহর কোরানের আলোর সাথে মিশ

বইটি বহন করে নবীর আভিয অবস্থার কথা

সমুদ্রের ন্যায় তাঁর পবিত্র মহিমা প্রকাশ কর।”

রুমি বলেনঃ
যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রাণ আছে আমি কোরানের দাস।

আমি মোহাম্মদের রাস্তার ধূলিকণা, নির্বাচিত ব্যক্তি।

যদি কেউ আমার বলা বাণী ছাড়া অন্য কিছু আমার নামে চালায়,

আমি তাকে ত্যাগ করব সেসকল শব্দের প্রতি ক্ষুক্র হয়ে।

রুমি আরও বলেনঃ

“আমি আমার দুই চোখকে “বিরত” রেখেছি

এই পৃথিবী আর আধ্যাত্মিক অভিলাষ থেকে যা আমি মুহাম্মদ থেকে শিখেছি।”

মসনবীর প্রথম পৃষ্ঠায় রুমি বলেনঃ

“হাথা কিতাবুল- মসনবী ওয়া হ্যায় উসুল উসুলি উসুলিদ-বীন ওয়া কাশুফুল কুরআন” “এই হচ্ছে মসনবী বই, এবং এটি (ইসলাম) ধর্মের মূলের মূল এবং এটি কোরানের বর্ণনাকরী।”

সাইদ হুসাইন নাসের বলেনঃ

রুমির সময়কার একজন মহান জীবিত ব্যক্তি ছিলেন হাজি

ইউনেক্সো একটি পদক ঘোষণা দেয় রুমির নামে যাতে করে এটি উৎসাহিত করে রুমির উপর গবেষণা এবং যাঁরা রুমির চিত্তা এবং আদর্শ প্রচারণা করছে; যেটি ইউনেক্সোর আদর্শিক দায়িত্ব বাড়তে সহায়তা করে।

আফগানিস্তানের সংস্কৃতি এবং যুব মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় পরিষদ গঠন করে, যেটি আন্তর্জাতিক দার্শনিক এবং কবিদের জন্মাদিন পালন করে, সেমিনারের আয়োজন করে এবং জীবনী নিয়ে আলোচনা করে। এতে বুদ্ধিজীবী, কৃট্টীভিত্বিদ এবং মাওলানার অনুসারীদের মহাসমাবেশ ঘটে মাওলানার জনস্থান বালখ এবং এটি অনুষ্ঠিত হয় কাবুলে।

ইরানে রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় মর্যাদা প্রদান

২০০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ইরানে ‘কুল বেল’ বাজানো হয় সারাদেশজুড়ে মাওলানাকে সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্য। একই বছর, ইরানে ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত রুমি সঙ্গাহ পালন করা হয়। একটি অনুষ্ঠান এবং সম্মেলন তেহরানে অনুষ্ঠিত হয়, এটি উদ্বোধন করেন ইরানের রাষ্ট্রপতি এবং ইরানের সংসদের চেয়ারম্যান। উন্নিশটি দেশ থেকে পঞ্চিতরা সেখানে যান এবং সম্মেলনে ৪৫০টি নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। ইরানি শিল্পী শাহরাম নাজেরিকে “লিজিওন ডি’অনার” দেয়া হয় এবং ২০০৭ সালে ‘ইরানের জাতীয় সংগীত পুরস্কার’ দেয়া হয় রুমির মাস্টারপিসের উপর তাঁর খ্যাতনামা কাজের জন্য।

২০০৫ সাল ইউনেক্সোর আন্তর্জাতিক বর্ষ ঘোষণা

ইউনেক্সো ২০০৭ সালকে ঘোষণা দেয় “আন্তর্জাতিক রুমি বর্ষ” হিসাবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ এ, তুরস্কে পালন করা হয় রুমির ‘আটশতম জন্মবার্ষিকী’ একটি বিশাল ঘূর্ণযমান দরবেশদের সামার মাধ্যমে যেটি আটচল্লিশটি ক্যামেরা দ্বারা টেলিভিশনে প্রচার করা হয় সরাসরি আটটি দেশে। তুরস্কের সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রী ইর্তুগাল গুয়ানী বলেন, “তিনি শরণ ও বেশি দরবেশ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে বলে ঠিক করা হয়েছে, এটি সামা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হবে।”

বিশ্ব পরিসরে রুমির অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা

“মাওলানা রুমি রিভিউ” (আইএসএসএন ২০৪২-৩০৫৭) বার্ষিকভাবে প্রকাশিত হয় এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি এবং ইরানি চৰ্চা কেন্দ্র থেকে সাইপ্রাসের নিকোশিয়ার রুমি ইনসিটিউট এবং ক্যামবিজের আকেটেইপ বুকস এর সহযোগিতায়। প্রথম খন্দ প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে এবং এরপর থেকে প্রতি বছর এটি প্রকাশ করা হয়। সাময়িকীটির প্রধান সম্পাদক লিউনার্ড লিওশন এর মতেঃ “গুরুত্ব এবং ফলাফল এ দাস্তে, শেক্সপিয়র এবং মিল্টন এর যদিও

কয়েকজন মুসলিম কবি সহজ প্রতিনিধী, পশ্চিমে তাঁরা সাহিত্য খ্যাতি উপভোগ করে কারণ আরবি এবং ফার্সি দার্শনিক, লেখক এবং কবিদের নগণ্য, তুচ্ছ এবং রচিত্ব হিসাবে দেখে ওয়েস্টার্ন ক্যাননের মহা আধ্যাত্মিক কাছে।

মাওলানা রুমি রিভিউ এর লক্ষ হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্যে এসব প্রশ্ন: মাইজভাণ্ডার কি?

তাচ্ছল্যপূর্ণভাবে অবসান ঘটানো, যেটি পশ্চিমা সাহিত্যের উত্তর: সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হলো “মাইজভাণ্ডার” ভুল কল্পনার চেয়েও আরও গভীর।”

মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার রুমির প্রভাব

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় (বাংলা নামক) এ ভূখণ্ডেও ধর্মীয় উত্তর: এর অবস্থান (সাবেক ইছাপুর পরগণায়) চট্টগ্রাম ও সাহিত্যাঙ্গণে, মৌলিকভাবে সুফিতত্ত্ব বিষয়ক প্রায় সর্বত্রই জেলার ফটিকছড়ি থানায় (বর্তমান: উপজেলা) এই মাওলানা রুমির সাহিত্য, বিশেষত মসনবী শরিফের মাইজভাণ্ডার মৌজার আয়তন আনন্দমিক ছয় কিলোমিটার।

রেফারেন্স অবিসংবাদিত ভাবে গ্রহণযোগ্য, মর্যাদাপূর্ণভাবে সীমানা: উত্তরে শাহ আহমদ উল্লাহ সড়ক ও লেলাং খাল। স্বনামধন্য বাঙালি মণীষা ড. মুহম্মদ এনামুল হক কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪০ সালে তাঁর পিএইচডি থিসিসে (Sufism is Bengal) মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার সঙ্গীত

তেলপারাই খাল। যোগাযোগ: চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রবিন্দু জিপিও থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দূরত্ব প্রায় ৩৮ কিলোমিটার। একেবারে সূচনাপর্বে (উন্বিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে) মূলত নৌকায় ছিল যোগাযোগের ব্যাপক মাধ্যম।

পরবর্তীকালে রেল যোগাযোগ, বর্তমানে মূলত সড়ক পথই যোগাযোগ এর মূল মাধ্যমে পরিগণিত। তবে বার্ষিক

উরস্ শরিফে সড়ক পথের পাশাপাশি কনসেশন টিকেটে সুস্পষ্টভাবে।

এখানে স্বরবীয় যে, মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তির বিশেষ টেনের ব্যবস্থাও বর্তমান। ডাক বিভাগ এবং

প্রয়োজনে এ ‘তুরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক’ সৈয়দ দেলাওয়ার টেলিফোন যোগেও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাথে হোসাইন মাইজভাণ্ডারী তাঁর বহুল আলোচিত ‘বেলায়তে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। দরবার শরিফের রয়েছে স্বতন্ত্র মোতলাকা’ গ্রন্থে মাওলানা রুমির সাহিত্য থেকে, শরিফ। কোড নং-৪৩৫২, টেলিফোন একচেঞ্জে: ২২০২৪৮।

মৌলিকভাবে ‘মসনবী শরিফ’ থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন প্রশ্ন: মাইজভাণ্ডার নামকরণ সম্পর্কে জানতে চাই প্রচুর।

উত্তর: আভিধানিক অর্থে মাইজ শব্দের অর্থ মধ্য, আর ভাণ্ডার অন্যান্য যে, মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তির বিশেষ টেনের ব্যবস্থাও বর্তমান। এই মাইজভাণ্ডার নামকরণের গবেষক সৈয়দ আহমদুল হক তাঁর জীবনের সবিশেষ পেছনে বাংলার ইতিহাস, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চট্টগ্রামকে উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় রচনা করেছেন মাওলানা রুমি কেন্দ্র করে বহিরাগতদের আক্রমণ, লুঁষ্টের অনেক স্মৃতি বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণায়। “বাংলার রুমি” বিজড়িত। এই পটভূমিতে বাংলার বার ভুইয়ার আত্মরক্ষা বলে সুপরিচিত সৈয়দ আহমদুল হকের বহুল আলোচিত ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে ইতিহাসের প্রশংসিত বাংলাদেশ ‘রুমি সোসাইটি’ গঠনের প্রথম শুভ প্রবহমান ধারায়। বার ভুইয়ার অন্যতম ইতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সূত্রপাত ঘটেছিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের শাহানশাহীবীর দুশা খাঁর পরিকল্পনায় এই মাইজভাণ্ডার গ্রামকে কেন্দ্র হয়েরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পরিচ্ছে “হক করে গড়ে উঠে খাদ্য এবং অন্ত্রে ভাঙ্গা। ভোগিতা

উত্তর: আভিধানিক অর্থে মাইজ শব্দের অর্থ মধ্য, আর ভাণ্ডার অন্যান্য যে, মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তির বিশেষ টেনের ব্যবস্থাও বর্তমান। এই মাইজভাণ্ডার নামকরণের গবেষক সৈয়দ আহমদুল হক তাঁর জীবনের সবিশেষ পেছনে বাংলার ইতিহাস, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চট্টগ্রামকে উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় রচনা করেছেন মাওলানা রুমি কেন্দ্র করে বহিরাগতদের আক্রমণ, লুঁষ্টের অনেক স্মৃতি বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণায়। “বাংলার রুমি” বিজড়িত। এই পটভূমিতে বাংলার সামাজিক আর প্রতিরোধ-সংগ্রামের ইতিহাস বাংলার সামাজিক প্রতিরোধ ও সংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে ইতিহাসের প্রশংসিত বাংলাদেশ ‘রুমি সোসাইটি’ গঠনের প্রথম শুভ প্রবহমান ধারায়। বার ভুইয়ার অন্যতম ইতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সূত্রপাত ঘটেছিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের শাহানশাহীবীর দুশা খাঁর পরিকল্পনায় এই মাইজভাণ্ডার গ্রামকে কেন্দ্র হয়েরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পরিচ্ছে “হক করে গড়ে উঠে খাদ্য এবং অন্ত্রে ভাঙ্গা। ভোগিতা

ইছাপুর পরগণার ফটিকছড়ি এলাকার প্রায় মধ্যভাগে বা “মাইজভাণ্ডার”।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারীয়া ঘরানার স্বনামধন্য সুফিতত্ত্বিক শব্দের অর্থ STORE বা গুদাম। এই মাইজভাণ্ডার নামকরণের গবেষক সৈয়দ আহমদুল হক তাঁর জীবনের সবিশেষ পেছনে বাংলার ইতিহাস, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চট্টগ্রামকে উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় রচনা করেছেন মাওলানা রুমি কেন্দ্র করে বহিরাগতদের আক্রমণ, লুঁষ্টের অনেক স্মৃতি বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণায়। “বাংলার রুমি” বিজড়িত। এই পটভূমিতে বাংলার সামাজিক আর প্রতিরোধ-সংগ্রামের ইতিহাস বাংলার সামাজিক প্রতিরোধ ও সংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে ইতিহাসের প্রশংসিত বাংলাদেশ ‘রুমি সোসাইটি’ গঠনের প্রথম শুভ প্রবহমান ধারায়। বার ভুইয়ার অন্যতম ইতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সূত্রপাত ঘটেছিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের প্রভাবের কারণে এগুলো অনেকটা পেছনে পড়ে ‘মাইজভাণ্ডারী’ নামটিই অস্থাগে চলে আসে। মাইজভাণ্ডারী গীতিকবি আবুদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুরীর ভাষায়: চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি, পরগণাতে

মাইজভাণ্ডারী, সিংহসনে সংগৌরবে, আছেন বাবা মাওলানা।

প্রশ্ন: একটি অজগড়া গাঁ, বাংলার অজস্র মৌজার একটি, মাইজভাণ্ডার আজ এত জনপ্রিয় এবং দেশ-বিদেশে পরিচিত ও প্রচারিত হয়ে উঠার কারণ কি?

উত্তর: ইছাপুর পরগণার এই মাইজভাণ্ডার মৌজা উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এক দৃষ্টি আকর্ষণীয় নতুন মাত্রিকতা লাভ করে। এখানেই জন্মস্থগ্রহণ করেন মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক ও প্রাণপুরুষ গাউসুল আয়ম শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ। মাইজভাণ্ডার মৌজার তাঁর জন্ম বলে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয় ‘মাইজভাণ্ডারী’ এবং তাঁর প্রবর্তিত তুরিকার নামকরণ নামকরণে নামকরণ করেন তাঁর জন্মতে চাই।

পরিত্রক মৌলীয়া তুরিকার, বিনাজুরী, কুতুবছর্জুড়ি, দমদয়া-রায়পুর মৌজার আবাসিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া মৌলীয়া আহমদ উল্লাহ জান জগতে মণ্ডে [মশহুর]।

মৌলীয়া আহমদ উল্লাহ স্মরণে এক সময়কালে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে, (সে সময়ের চলমান সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা) উচ্চ শিক্ষিত ও গণ্যমান্য বিজ্ঞানদের সমোদূর্ধন করা হতো “মৌলীয়া” বলে। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আয়ম শাহ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী তাঁর মাত্র ৫০ বছর বয়সে এলাকায় (মণ্ডে) মশহুর তথা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, সেটি ১৮৮৬ সালে কথা।

প্রশ্ন: মাইজভাণ্ডার নামের সাথে ‘শরিফ’ শব্দটি উচ্চারণ করা হয় কেন?

উত্তর: গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর পরিত্র জন্মস্থান এবং তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রতি যথার্থ সমান মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ‘শরিফ’ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর পৌত্র ও অঙ্গ সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই নামকরণটি আনন্দনিকভাবে সরকারী স্বীকৃতিগত লাভ করেছে মাইজভাণ্ডারী ভাষায়: চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি, পরগণাতে

মহিলা মহল

সৃষ্টির প্রথম নারী : হ্যরত হাওয়া (আঃ)

যাঁর সৃষ্টিটা সকল কার্যকারণ সম্পূর্ণ উদ্ধের, পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহু রাকুল আলামিনের “কুন ফায়ারুন” (সূরা ইয়াসিন আয়াত-৮১-৮২) এরই বাহিষ্প্রকাশ, সে ক্ষেত্রে এ সৃষ্টির স্বাভাবিক উত্তরাধিকার সূত্র কিংবা আমাদের জাগতিক ধারণাজাত বিধিবদ্ধ বর্ণনার সম্পূর্ণ উদ্ধের। এক কথায়, কল্পনারও বাইরে।

আমরা আলোকধারার পক্ষ থেকে ‘মহিলা মাহফিল’ পর্ব শুরুটা করতে চাই সৃষ্টির প্রথম মহিলা হ্যরত মা হাওয়া (আঃ) কে দিয়ে।

বলাবাহ্য, এ বর্ণনা যতটুকুনা জাগতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিজ্ঞাত, তার চেয়ে দের বেশী আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ও রহস্যপূর্ণ এবং মূলত মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে প্রযোজিত এ বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা সৃষ্টির প্রথম নারী সম্পর্কে আলোচনা করব মূলত আল্লাহর পবিত্র কুরআনেরই বর্ণনার আলোকে-

সৃষ্টির প্রথম কথা: পবিত্র কুরআনে মানুষের আদি মাতা ‘হাওয়া (আঃ)’ এর সৃষ্টি বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তবে সূরা নিসা, সূরা রূম ও আরাফে আদি পিতা হ্যরত আদম (আঃ) এর শরীরের অংশ থেকেই যে তার সৃষ্টি তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বুখারী শরিফের হাদিসেও এ বর্ণনার অনুরূপ আছে। সূরা নিসার বর্ণনা মতে- হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তাঁর সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের দু’জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। (সূরা নিসা, আয়াত-১)

সূরা নিসার এ বর্ণনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হাদিসের বর্ণনায়ও। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) ইবনে আবাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘হাওয়াকে’ আদম (আঃ) এর বাম পাঁজরের সবচাইতে ছেট হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন আদম (আঃ) ঘূর্ণত অবস্থায় ছিলেন। পরে সে স্থানটি আবার গোশ্চত দ্বারা পূরণ করে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘হাই’ তথা জীবন্ত সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে তাঁর নাম হয়েছে ‘হাওয়া’।

নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ প্রসঙ্গ: হ্যরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়াকে জাল্লাতের অনন্ত-অনাবিল সুখ-শাস্তির মধ্যে আল্লাহ একটি শর্ত জড়ে দিয়েছিলেন। তা হলো, বেহেশ্তের সবকিছু ভোগ ও উপভোগ করতে পারবেন তাঁরা, তবে ব্যক্তিগত শুধু একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল ভক্ষণ। এ গাছটি কি অর্থাৎ এটি কোন ফলের গাছ পবিত্র কুরআনে তা কিন্তু উহ্য রাখা হয়েছে রহস্যজনক কারণে। সূরা আরাফের বর্ণনায় গাছের নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছে- ‘হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গী জাল্লাতে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আছার কর কিন্তু

বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে আর সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে। (সূরা আ’রাফ, আয়াত ১১-২৫)

দুনিয়াতে তাঁদের অবস্থান: এই ঘোষণার পর হ্যরত আদম (আঃ) কে সিংহলে (CEYLON-শ্রীলঙ্কা) এবং হাওয়া (আঃ)

অস্ত্রুক্ত হবে।’ (সূরা আ’রাফ আয়াত-১৮-১৯)

এ ফলের পরিচিতি: প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ গাছটির পরিচয় নগরীর নামকরণ আজও সেই সৃষ্টি অমর করে রেখেছে। আজও রহস্যবৃত্ত। [ওলা তাকরাবা হায়হিস শাজারাতা] (এই উভয়ে সাড়ে তিনশত বছর এককী জীবন যাপন করে গাছটি উপকারী নয়, সুতরাং এর কাছে যেয়োনা] সূরা অবশেষে সৌন্দি আরবের প্রতিহাসিক ‘আরাফাত ময়দানে’ বাকারার ৩৫নং এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মিলিত হন। আতিথানিকভাবে ‘আরাফাত’ শব্দের অর্থ মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটি ‘আক্ষুর’ গাছ। মিলন। সৃষ্টির সর্বপ্রথম নর ও নারীর অপূর্ব মিলনস্তুল হিসেবে কারো মতে ‘ডুমুর’ গাছ। ওহাব (রহঃ) এর বর্ণনা মতে এর এই স্থানটির নামকরণ হয়েছে ‘আরাফাত’। আর এই দানাগুলো ছিল মাখন অপেক্ষা নরম আর মধু অপেক্ষা মিষ্ট। মিলনকে সমকাল এবং অনাগত আদম সন্তানদের কাছে ইহুদীদের ধারণা হলো, গাছটি ছিল ‘গমের’।

চিরস্মরণীয় ও জাগরুক রাখার প্রয়োজনে পবিত্র হজ্জের তিনি নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পরিণতি: আল্লাহর নিষেধ অমান্য করার ফরজের মধ্যে অন্যতম হলো হাজীদের এই আরাফাত অপরাধে আদম (আঃ) এবং হাওয়াকে বেহেশ্ত থেকে ময়দানে মিলিত হওয়া; যাতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারম্পরিক বিতাড়িত করে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়।

সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক বহুমাত্রিক গভীরতর প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শয়তান (ইবলিশ) কর্তৃক প্রতারিত হয়ে ভাবনারস্ত নিহীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রতিহাসিক বেহেশ্ত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ স্মৃতিকে নতুনভাবে জাগরুক, আরো সুগভীর মর্যাদাপূর্ণ নতুন সন্ধিকাল সময়ের আচর্যরকম ঘটনাবলীর, ফল ভক্ষণের মাত্রিকতা দান করেছে নবী আখেরুজ্জামান হ্যরত আহমদ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায় সূরা আ’রাফ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর প্রতিহাসিক বিদায় বিভিন্ন আয়তে। এগুলো সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করলে ঐ হজ্জের ভাষণ। “ইয়া আইয়ুহান নাস” বলে মুসলিমানদের সময়ের চির পাওয়া যায় এভাবে: ‘আর আমি বললাম, হেসীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব মানব সম্পদায়কে সংস্কার করে এ আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গী জাল্লাতে বাস কর এবং ভাষণের মাধ্যমে “মহান স্রষ্টা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী যেখানে ইচ্ছা যাও এবং খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও রূপরেখা আনন্দানিকভাবে ঘোষণা হয়েছিল এই আরাফাত না, গেলে তোমরা সীমালজ্জন করবে।’

তারপর তাঁদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ মা হাওয়ার সৃষ্টিতে জেন্দা নামকরণ ও কবরের স্থান: সৌন্দি করার জন্য শয়তান তাঁদের (আদম-দম্পত্তিকে) ফুসমন্তর আরবের অর্থনৈতিক রাজধানী, প্রধান সমুদ্র বন্দর ও শিল্প দিল ও বলল, ‘যাতে তোমরা দুজনে ফেরেশ্তা বা অমর না নগরী জেন্দার নামকরণ নিয়ে অনেক মতবাদ প্রচলিত হতে পার তার জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ সমক্ষে থাকলেও ‘জাদু’ শব্দ থেকে এর উৎপত্তির বিষয়টি প্রায় তোমাদের নিষেধ করেছেন।’

সর্বজন ইগুণী। আরবি ‘জাদু’ অর্থ দাদীমা (Grand شয়তান তাঁদের দুজনের কাছে শপথ করে বলল, ‘আমি তো Mother)। মানবজাতির আদি মাতা মা হাওয়াকে আরবরা তোমাদের একজন হিতৈষী।’

‘দাদী মা’ বলেই স্মরণ করে। জেন্দার নগরকেন্দ্র বালাদের এভাবে সে তাঁদের ধৈঁকা দিল। তারপর যখন তাঁরা সেই কাছে, মদিনা রোডের পাশে মা হাওয়ার সমাধি বিদ্যমান। গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাঁদের লজ্জাস্থান তাঁদের কবর স্থানের মূল ফটকে আরবীতে লেখা আছে-“মাকবারাহ কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো। আর তাঁরা বাগানের গাছের পাতা হাওয়া”。 অর্থাৎ হাওয়ার কবরস্থান।

দিয়ে নিজেদের ঢাকার চেষ্টা করল। তখন তাঁদের প্রতিপালক মা হাওয়া প্রসঙ্গে নারী জাতির প্রতি পুরুষের আচরণ প্রসঙ্গে তাঁদের তেকে বললেন, ‘আমি কি তোমাদের এ গাছের হাদিসের বর্ণনা: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ব্যাপারে সাবধান করে দিই নি? আর শয়তান যে তোমাদের সাল্লাম ওসিয়ত করে গেছেন নারীদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার প্রকাশ শুরু আমি কি তা তোমাদের বলি নি?’

করার জন্য। আরু হ্রায়রা (রাঃ) হতে বর্তিত, হ্যরত তাঁর পেছনে ক্ষমা না করেন সঙ্গে দৈর্ঘ্য প্রদান করে ছিলেন। আর শয়তান যে তোমাদের সাল্লাম ওসিয়ত করে গেছেন নারীদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার অবলম্বন করা তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিহস্তদের অত্যর্ভূত হব’।

সম্পর্কে আমার ওসিয়ত বা বিশেষ পরামর্শ নির্দেশ তোমার তিনি বললেন, ‘তোমরা একে অন্যের শক্ত হিসাবে কিন্তু তা পালন করে চলবে। নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্বপ্রথম কালের জন্য পৃথিবীতে নেমে যাও। আর (সেখানে) নারী আদিমাতা হাওয়া) পাঁজরের (উর্ধ্বতম) হাড় হতে সেষ্ট। তোমাদের জন্য বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা রাখল।’ তিনি পাঁজরের হাড়সমূহের মধ্যে উর্ধ্বতম হাড়খানাই সর্বাধিক

বাঁকা। তুমি যদি তা পূর্ণ সোজা করতে তৎপর হও (যেমন তুমি তোমার মন মতো সোজা না করে ছাড়বে না) তবে তা ভেঙে যাবে। আর যদি তোমার মন মতো পূর্ণ সোজা করায় তৎপর না হও, তবে অবশ্য তার মধ্যে একটু বক্তব্য থাকবে, (কিন্তু ভাঙবে না আস্ত থাকবে, তুমি তার দ্বারা সাহায্য, সহায়তা লাভ করে নিজের অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারবে)। সুতরাং আবার বলছি, নারীদের (নারীদের সঙ্গে দৈর্ঘ্য সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার) সম্পর্কে আমার ওসিয়ত বা বিশেষ আদেশ পরামর্শ তোমরা তা মেনে চলবে (বোখারি শরিফ)।

আবু হ্রায়রা (রাঃ) হতে বর্তিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্ত্রী লোককে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনো তোমার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করবে না বা সোজা হয়ে চলবে না। আর যদি তুমি তার বক্তব্য মেনে নিয়ে তার কাছ থেকে ফায়দা পেতে চাও তাহলে ফায়দা পাবে। আর যদি তার বক্তব্য সোজা করতে যাও তাহলে তাকে ভেঙে ফেলবে। আর ভেঙে ফেলার অর্থ হলো তালাক (মুসলিম শরিফ, ৫ম খণ্ড)। এতসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সন্ত্রেণ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, “এবং তাদের আটকে রেখো না যাতে তোমরা তাদের যা প্রদান করেছো তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সঙ্গে সঙ্গাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন”।

বাংলাদেশের জাতীয় কবির কবিতায় এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন: পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রথম নারী মা হাওয়ার সৃষ্টিধারায় তাৎ নারী জাতির শাশ্বত-চিরায়ত বৈশিষ্ট্য এবং পুরুষের সার্বিক বিকাশে তাঁদের প্রকাশ্য ও অস্তনিহিত গভীরতম বিশেষত চিকিৎসের মতো প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘নারী’ কবিতায়:

-এ-বিশেষ যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
জানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী,
সুম্বা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিয়ে রূপে রূপে সঞ্চারি।

পুরুষ এনেছে যামিনি-শানি-, সমীরাগ, বারিবাহ!
দিবসে দিয়াছে শক্তি সাহস, নিশ্চীতে হয়েছে বধু,
পুরুষ এসেছে মর্গত্বা লয়ে, নারী যোগায়েছে মধু।

শস্যক্ষেত্রে উর্বর হল, পুরুষ চালাল হাল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বহে হাল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীমে।

স্বর্ণ-রোপ্যভার,
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলক্ষার।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাষ্ঠলপুরী (১৮৭০-১৯০৫)

আনুমানিক ১৮৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার অস্তর্গত কাষ্ঠলপুর গ্রামে প্রখ্যাত সৈয়দ ও মাওলানা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাফেজ মাওলানা সৈয়দ আবদুল উহুয়া (রহঃ)। মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যসূত্রে জানা যায় যে, হ্যরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাষ্ঠলপুরী (রহঃ) হ্যরত গাউসুল আয়ম (কঃ)'র [শাহ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ১৮২৬-১৯০৬] মহান বেলায়তী নিয়ামত বিতরণের প্রথম পর্যায়ের খলিফাদের অস্তর্ভূত। তিনি ফানাফিশ-শাইখ ছিলেন। হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র শানে রচিত তাঁর গানগুলো অনেক উচ্চমার্গীয়। তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর পীরমুর্শিদ হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র সম্মুখে তাঁর রচিত গানগুলো নিজে গেয়ে শোনাতেন। হ্যরত কেবলা (কঃ) তাঁর এ গানগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা ও হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর শান ও আজমত বর্ণনা করে তিনি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গান রচনা করেন। অস্তর্গত ভাবসম্পদ গুণে তাঁর গানগুলো আজও মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর মেট গানের পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়। তবে রত্নসাগর নামক মাইজভাণ্ডারী গানের বইটিতে তাঁর রচিত ৯৪টি (চুরানবইটি) গান রয়েছে। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্ডিল থেকে প্রকাশিত মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন গ্রন্থ 'রঞ্জতান্ত্র' ১ম ও ২য় খণ্ডে তাঁর এ গানগুলো বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। সংখ্যার বিচারে নয়, অস্তর্নিহিতভাব এবং উচ্চমার্গীয় মর্মার্থ ও রূহানী উর্ভবজ্যতের অনন্য সোপান এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে এই গানগুলো মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ এবং মাইজভাণ্ডারী আশেক ভজনের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছে কালের প্রবহমান ধারায়।

হ্যরত কেবলা আলম তাঁর গানগুলো গভীরভাবে শুনতেন এবং তাঁর গানে কিছু সংযোজন বিয়োজনও করতেন। যেমন: মাওলানা হাদী লিখেছিলেন: 'সঙ্গে হাদী মাতোয়ারা রঙে গাউচুধন।' হ্যরত কেবলা সংশোধন করে দেন এভাবে-'রঙে হাদী মাতোয়ারা সঙ্গে গাউচে ধন।' তিনি এই গানগুলো 'মসনবী' বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

রত্ন সাগর ১০ম গান

দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইল্লাহা।
ঘটে ঘটে আছে জারি লা ইলাহা ইল্লাহা।
ঘটের সারেঙ্গি বিছে প্রেমরতনের তার লাগাইছে,
মাওলাজির নাম জপ লা ইলাহা ইল্লাহা।
সঙ্গ রঙি টঙি বিছে রংধন কামিনী নাচে,
প্রেমেতে বিভোর জপ লা ইলাহা ইল্লাহা।
মঞ্জিলে মঞ্জিলে মন গাউচ ধনের সিংহাসন,
হাদীরে তল্কিন করে লা ইলাহা ইল্লাহা।

টিকা ভাষ্য]

গাউচুধন: মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুলআয়ম এটি ফাঁপা এক কাঠের যন্ত্র। উপরের দণ্ড অংশে আঙুল শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (১৮২৬-১৯০৬)। তাঁর রাখার জন্য একটি কাঠের পাত লাগানো হয়। নীচে একটু বড় তুরিকার বিশেষত্ব হলো, বিভিন্ন পর্যায়ের আধ্যাত্মিক সাধনার রকমের ফাঁপা অংশটার দুই পাশে 'S' এর মতো করে কাটা যথে সেমা বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের অনুপাতিক সুষম থাকে। মোটা খাট আকারের একটি ছড়ি দিয়ে সারেঙ্গী সংযোজন। এ অনুষঙ্গে মাইজভাণ্ডারী গানের উত্তর এবং বাজানো হয়। এ যন্ত্রে কোন ঘাট নাই। গানের সাথে ক্রমবিকাশের ধারায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কালোন্তীর্ণ রচনায় এ সঙ্গীতের জন্য বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত জগৎ সমৃদ্ধ। এ গানের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হলো তুরিকার তারও লাগানো হয়।

প্রবর্তক কোন গান রচনা করেননি; তাঁর আশেক-ভজনাই এ গানের রচয়িতা এবং মূলত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীকে কেন্দ্র করেই গানগুলো রচিত। এ ধারায় সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গীতিকার হলেন: মাওলানা আবদুল হাদী কাষ্ঠলপুরী, মাওলানা আবদুল গণি কাষ্ঠলপুরী, মাওলানা আবদুস সালাম ভুজপুরী (ভাত্তার্য), মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী, আবদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুরী, কবিয়াল রমেশ শীল। আমাদের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে শতাধিক গীতিকারের আট সহস্রাধিক গানের সঙ্কান মেলে যা বহুমান নদীর সাবলীল স্নেতধারার মতো কালের সাথে তাল মিলিয়ে সৃজনশীল ধারায় সতত প্রবহমান।

মাইজভাণ্ডারী গানের মধ্যে গীতিকারেরা এ তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিভিন্ন অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন। যেমন: 'মুর্শিদ', 'প্রিয়া', 'নিরঙ্গন', 'মাওলাজি', 'প্রেমনির্ধি', 'গাউচুধন' ইত্যাদি।

ঘটে ঘটে: মোকামে-মোকামে। স্তরে স্তরে। আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমায় মৌলিকভাবে একান্ত আত্ম উপলক্ষি ও আত্ম

উল্লয়নের ধারার জিকিরের বিভিন্ন স্তর। যেমনঃ কলব, রুহ, ছের, খুফি, আগফা, নফস ইত্যাদি।

রুহ: আল্লাহর মহিমান্বিত নির্দেশ বিশেষ। পবিত্র কুরআনের সূরা হিজরের বর্ণনামতে, আল্লাহ মাটি দিয়ে মানুষকে তৈরী করার পর তার মধ্যে রুহ প্রতিষ্ঠাপন করেন। রুহের গভীর তাংপর্য বর্ণিত হয়েছে সূরা বনি ইসরাইলের ৮৫নং আয়াতে: আপনাকে ওরা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন 'রুহ আমার প্রতিপালকের আজ্ঞাধীন' এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জান দেওয়া হয়েছে।

তল্কিন: শিখিয়ে দেওয়া। (আ.না. স্বীং): ধর্মোপদেশ, শিক্ষাদান, জ্ঞানদান, উপদেশ, আদেশ, প্রশিক্ষণ দেওয়া। সাধারণভাবে করবে শায়িত ব্যক্তিকে মনকীর-নকীরের প্রশ্নের জবাব করবের উপর থেকে শিখিয়ে দিতে পারেন এমন 'কশ্ফ'-খোলা কামেল অলির সর্বাত্মক সহায়তা প্রসঙ্গ।

সারেঙ্গী: প্রাচীনতম এ বাদ্যযন্ত্রটির উৎপত্তির ইতিহাস এখনো রহস্যাবৃত। অনেকের ধারণা প্রাচীন সারঙ্গ বীণারই রূপান্তরিত রূপ হলো সারেঙ্গী। কারো মতে এটি প্রাচীন পিনাকী বীণারই

নতুন রূপ। কারো কারো মতে এটি রাবণেরই আবিস্কৃত যন্ত্র। প্রাচীন কাঠের যন্ত্রে আঙুল শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (১৮২৬-১৯০৬)। তাঁর রাখার জন্য একটি কাঠের পাত লাগানো হয়। নীচে একটু বড় তুরিকার বিশেষত্ব হলো, বিভিন্ন পর্যায়ের আধ্যাত্মিক সাধনার রকমের ফাঁপা অংশটার দুই পাশে 'S' এর মতো করে কাটা যথে সেমা বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের অনুপাতিক সুষম থাকে। মোটা খাট আকারের একটি ছড়ি দিয়ে সারেঙ্গী সংযোজন। এ অনুষঙ্গে মাইজভাণ্ডারী গানের উত্তর এবং বাজানো হয়। এ যন্ত্রে কোন ঘাট নাই। গানের সাথে ক্রমবিকাশের ধারায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কালোন্তীর্ণ রচনায় এ সঙ্গীতের জন্য বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত জগৎ সমৃদ্ধ। এ গানের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হলো তুরিকার তারও লাগানো হয়।

সুফি উদ্ধৃতি

- আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তিনটি স্বত্ব দান করেন। যথা- (ক) সমুদ্রের মত বদান্যতা, (খ) সূর্যের ন্যায় উদারতা ও (গ) ভূতলের ন্যায় ন্যায়তা।"
- আল্লাহ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করেন, তার পিছনে এক ফিরআউন লাগিয়ে দেন।"
- সৎ সাহচর্য সৎকার্য থেকে উত্তম আর কুসংসর্গ কুকার্য থেকে মন্দ।"

-হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

সুফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তঃষ্ঠি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দুটোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা ক্রতৃজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনির্ণয়।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে বাগড়া করে না, কেউ বাগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।
- ধৈর্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহর সাথে লিঙ্গ রাখে।
- রুজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াকুল।
- দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষি না হওয়াই হল ন্যূনতা বা বিনয়।

-হ্যরত জুনাইদ বাগদামী (রহঃ)

পাঠক প্রতিক্রিয়া

‘বেলায়তে মোত্লাকা’ বিংশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থ বিষয়ে একবিংশ শতাব্দীর একজন পাঠকের প্রতিক্রিয়া

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

বিংশ শতাব্দীর ৬০ এর দশকে (১৯৬০ সালে) প্রকাশিত সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে একান্ত দায়িত্বশীলতার সাথে সমর্থিত উপায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার তত্ত্ব ও তথ্য বিষয়ক সর্বপ্রথম একটি গ্রন্থ অর্ধশতাব্দীকাল পরেও (২০১৮ সালে) একজন পাঠককে কোন মাত্রায় গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে নানাভাবে বিচিত্র মাত্রিকতায় তারই একটি নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক রেখাচিত্র অংকণই আমার অভিপ্রায়। জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গম স্থলে দাঁড়িয়ে একান্ত জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তু এবং বর্ণনার যুক্তি ও প্রাসঙ্গিকতার মুসিয়ানায় বিষয়টি একবিংশ শতাব্দীর ২য় দশকের একজন পাঠককে যেভাবে ভাবিয়ে তুলেছে তার একান্তভাব প্রকাশের সহজ, সরল, নিবারণ ও নিরাভরণ বর্ণনার ফসল হিসেবে বিবেচনা করার বিনোদ নিবেদন হিসেবে এ প্রবন্ধের অবতারণা।।

‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থটি রচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

সময়কাল: আজ থেকে ৬০ বছর পূর্বে ১৯৫৮ইং সালের ২৪ জানুয়ারি।

স্থান: মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, পূর্ব পাকিস্তান।

প্রেক্ষাপট: ইউরোপে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব ধর্ম কনফারেন্সে নির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট আলোচনার অন্যতম বিষয় হিসেবে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে স্থানকালপাত্র ভেদে সুফিবাদের বিবর্তনের ক্রম

বিকাশের ধারায় তৎকালীন মাশরেকী পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রভাব ও সমাজ জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ এবং একইসাথে এই উপমহাদেশে ভারতের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজমীর শরিফের অবস্থান ও প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে সন্দর্শন এবং অবগত হওয়ার [FOLK LORE FIELD WORK] প্রয়োজনে এই আন্ত মহাদেশীয় একাডেমিক সফর এবং সুনির্দিষ্টভাবে মাইজভাণ্ডার শরিফ গমন।

চট্টগ্রামেই সাবেক জেলা প্রশাসক MR. MACANNANGI (C.S.P) এর মতো প্রশাসনিকভাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান একজন সমাজ-নিরীক্ষককে সাথে নিয়ে তিনজনের এক ইউরেপিয়ান প্রতিনিধিদল গাউসুল আয়ম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) ১০ মাসের ৫২তম দেশ শরিফ উপলক্ষ্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ আগমন

করেন। তাঁরা একদিন জুমার নামাজসহ উরসু শরিফের বিভিন্ন অবস্থারের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী বছর (১৯৫৯) ১০ মাসের ওরশ শরিফ উপলক্ষ্যে সুদূর আমেরিকা থেকে আগত Robert w. FAWLER নামে একজন গবেষক এসে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে যে লিখিত মন্তব্য করেন, শুরু চলমান বিভাট আর বিভাস্তির নিরসনের পথে তাও ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ-

I am extremely happy to have been a guest in the home of the religious leader and to view of the activities of a great festival as is taking place we are appreciative of your wonderful hospitality.

Sd. Robert w.

FAWLER
23.10.59

J.C.A Agriculture

মাত্র ১ বছরের ব্যবধানে এহেন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুই প্রতিনিধিদল ৩০. এর আগমন, যোগাযোগের প্রয়োগে ঐ সময়কালে প্রায় দুর্গম মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ এসে দরবারের তৎকালীন সাজাদানশীল, অছিয়ে গাউসুল আয়ম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (১৮৯৩-১৯৮২) উষ্ণ আতিথ্য গ্রহণ করে মৌলিকভাবে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে যে বিষয়গুলো ০৮.

০১. “মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের” মৌলিক বিশেষত্ব কি?
০২. বিশ্ব মানবতার জন্য এর কোন অবদান আছে কি?
০৩. এটি গতানুগতিক সুফি মতবাদ? না নতুন কিছু?
০৪. এই বেলায়তের যিনি মূল (প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর ০৫.

অনুসারীদের মূল নীতি কি?

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বিশ্ব ধর্ম কনফারেন্সের অন্যতম এজেন্ট হিসেবে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা, দর্শন এর রূপরেখা বিষয়ক এহেন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসার বিষয়টি মাইজভাণ্ডারের সাজাদানশীল হিসেবে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলে। এমতাবস্থায় তাঁর যে স্বগতোক্তি তা সত্যিই প্রতিধানযোগ্য:

এরই প্রেক্ষিতে এহেন বিশ্ব প্রেক্ষাপটের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের বিষয়টি আসলে কি? এর অন্তর্নিহিত মর্মার্থ কি? এন্দের জানার মৌলিক বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক হিসেবে; মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেও গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলে। একইসাথে এতবড় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের পক্ষ থেকে কার মাধ্যমে বা কাদের দ্বারা, কীভাবে এ প্রশ্নগুলো যথাযথ মর্যাদায় একান্ত বিশ্বত্বার সাথে উপস্থাপিত হবে তাও একটি অতি সুস্ক্র ও জটিল সমীকৰণ হিসেবে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। তিনি ঐ সময়কালের প্রেক্ষাপটে একান্ত ভাবনাগুলোকে তাঁর স্বীয় মনোভাব হিসেবে ব্যক্ত করেছেন এভাবে-

হযরত গাউসুল আয়ম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীয়ার বেলায়তের (আধ্যাত্মিক) প্রত্যক্ষ সাহচর্য প্রাণ বুর্জুর্গানে দ্বীনের অনেকে ইতোমধ্যে ইন্তিকাল করেছেন।

০২. তাঁদের পরবর্তীদের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকে [বৃহত্তর অংশ] খেদমত ও সোহবত থেকে বঞ্চিত বিদ্যু ত্বরিকার প্রবর্তকের বেলায়ত তথা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ নানা মনগঢ়া কাজকর্ম ও কথাবার্তা বলে থাকেন।

‘পরবর্তীদের পরবর্তী’ বলে দাবীদার কোন কোন লোকের অজ্ঞতাজনিত কথাবার্তা ও কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয়, যে কোন কারণে হোক এই বেলায়তের এক বিকৃতরূপ জাহির করতে তারা কর্মতৎপর।

কিছুসংখ্যক ভবযুরে লোক তাঁদের নিজ অভ্যন্তর পাণ্ডোষ, অর্কর্মন্তা ও কর্মবিমুখতা প্রভৃতি দোষ চাকানোর গরজে (প্রয়োজনে) নিজেদের “মাইজভাণ্ডারী” বা “আজমিরী” বলে জাহির ও দাবী করে থাকে। [যে কারণে সাধারণে মাইজভাণ্ডারের নানা অপবাদ হয়]।

যদিও নির্দোষ গান বাজনা কোন ধর্মে নিষেধ নেই, তবুও মৌলিক সাহেবোন সর্বপ্রকার গান-বাজনা মোটামুটিভাবে একতরফা মনোভাবে নিষেধ করে চলেছেন। [ফলে মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক গান ও সামা সাধারণে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ও ক্ষেত্র বিশেষে বাঁধারও সম্মুখীন হতে দেখা যায়]।

যারা ব্যবসার ভিত্তিতে পীর ওয়ায়েজ নথিত করে মাদ্রাসা-মসজিদের নাম করে জীবিকা নির্বাহ করে

থাকে তারা অবস্থা বুঝে, মজলিশ খুনী কিংবা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে সামাজিক উক্ফনার গরজে দুঁচারটি মুখরোচক স্বীয় হীন স্বার্থে [বাজার গরম করা] কথা বলতে হয় [বলাবাহল্য, এরা এর জন্য ব্যাপক জনপ্রিয় ও সমীহ জাগানিয়া দুটো দরবার] মাইজভাণ্ডার শরিফ ও আজমীর শরিফ সম্বন্ধে (সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে) অপ্রচার করেন। আবার কিছু লোক এমন আছেন, যারা প্রত্যক্ষ সত্য যাচাই এর অভাবে কানে শুনা কথায় বিশ্বাস করে শরিয়তী-রীতিনীতির সঙ্গে বেমিল মনে করে এ দরবারের কুৎসা রটনায় অভাস হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে স্থানমধ্যন্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর ভাষায়: আল্লাহকে ডাকার নামে কাজ ফেলে মাইজভাণ্ডারী শিষ্যদের মতো বিনা কাজে সময় কাটানোর কোনো মানে নাই। (সিদ্ধ সংখ্যা বিচ্চা, ১৯.১৯৭৭, পৃ.-১৪)

এ প্রসঙ্গে তাঁদীয় পুরোনো ঢাকার বাসভবনে এক অন্তরঙ্গ একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি ঐ সময়কালের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, ‘শৈশবকাল থেকে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে লোকমুখে শুনতে শুনতে আমার এ রকম প্রতীতি জন্ম নিয়েছে।’ আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, তিনি কখনো পেশাগতভাবে সাংবাদিকতা, এমনকি কৌতুহল কিংবা মননশীল জিজ্ঞাসার প্রয়োগে প্রত্যক্ষভাবে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে কখনো চিষ্টা-ভাবনাও করেন নি। কিন্তু আচর্যের বিষয় তাঁর এই প্রেক্ষাপটের বর্ণনা ছাড়া শুধুমাত্র লোকমুখে শুনা ধারণার প্রেক্ষিতে ছোট মন্তব্যটুকু আমাদের দেশের বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী মহলে মাইজভাণ্ডার বিষয়ক একটা নেতৃত্বাচক মনোভাব সৃষ্টিতে ঐতিহাসিকভাবে বহুলাশে ক্রিয়াশীল ছিল, যার প্রভাব আজও প্রায় সমানভাবে প্রবহমান। প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডার বিষয়ে গত শতাব্দীর শেষ দশকে (১৯৯৩) বাংলা একাডেমির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে উচ্চতর গবেষণাকালীন সময় এহেন নেতৃত্বাচক প্রভাবটি [অবচেতনভাবে ক্রিয়াশীল] প্রত্যক্ষ করেছি আমি নিজেও।

উল্লেখিত ষটি সুস্ক্র, জটিল সমীকৰণের সমাধানের প্রশ্নটি দরবারের সাজাদানশীল হিসেবে, সর্বেপরি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা বা দর্শনের একমাত্র বৈধ মুখ্যপাত্র হিসেবে অছিয়ে গাউসুল আয়ম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলে। এমতাবস্থায় তাঁর যে স্বগতোক্তি তা সত্যিই প্রতিধানযোগ্য:

তাহাদের এহেন ভুল ধারণা ও অপপ্রচার এবং অথবা বিরোধ-ফ্যাসাদ দিন দিন দানা বাঁধিতে থাকিবে মনে করিয়া এবং মিশনারী আগম্বক তত্ত্বজ্ঞান-অন্ধেষ্টী ব্যক্তিদের প্রশ্নের সমাধান, ত্বরিতপদ্ধতী ও বেলায়ত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সুবীরগের জ্ঞাতার্থে, আমি জ্ঞানে আকদাস হয়ে ত শাহসুফি মৌলানা সৈয�়দ আহমদ উল্লাহ (কঠ) সাহেবের অনুগ্রহ ও খেদমত সোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী বংশধর, তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্তান মৌলানা সৈয়দ ফয়জুল হক মরহুম শাহ সাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র এবং হয়েরত আকদাসের সাজাদানশীল বিধায় নৈতিক দিক দিয়া এই বেলায়তের স্বরূপ উদ্ঘাটন-রূপ দুষ্টাহসী কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম। (বেলায়তে মোত্লাকা, ১৩-স, পৃ. ১১)

‘দুষ্টাহসী’ এই ঐতিহাসিক দায় দায়িত্ব পালনে তুলনারহিত নিষ্ঠা ও সততার সাথে আরন্ধ কর্ম সম্পাদন করে মাত্র দুই বছরের মধ্যে এর পাঞ্জলিপি প্রস্তুত করে তা গ্রন্থকারে প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেন ১৯৬০ সালে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় গৃহ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আরবি, ফার্সির চৰ্চা, চট্টগ্রাম মোহচেনিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া এবং মাত্র ১৭দিন বাংলা পড়ার অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় পরিত্ব কুরআন হাদিসের পাশাপাশি ৫টি আরবি, ৭টি ফার্সি, ১২টি উর্দু এবং ৩টি বাংলা ভাষার কিতাব থেকে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে সরল বাংলা ভাষায় ৮ ফর্মার (১৪৫ পৃ.) এ গ্রন্থটি প্রণয়ন ও প্রকাশ আমাদের রীতিমতো বিস্মিত করে। বলাবাহ্ল্য, এটি তাঁর প্রথম গবেষণা এবং সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও বটে। আমাদের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে এর পূর্বে তাঁর কোন গ্রন্থের পাঞ্জলিপি রচিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থের শেষাংশে যে বিনীত নিবেদন, তাও একজন গবেষক হিসেবে তাসাওউফ, প্রচলিত শরিয়ত এবং ফিকাহ ইত্যাদির সুক্ষ্মতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ এবং জনসম্প্রস্তুত শব্দ ব্যবহারের মুসিয়ানার ছাপ আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর ভাষ্যঃ

মানবের দৈহিক সুস্থিতা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠুতা যেমন দরকারী ও মূল্যবান, মানসিক সুস্থিতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সুষ্ঠুতাও তেমনি নিতান্ত প্রয়োজন। যাহার অভাবে মানব ধীন-দুনিয়াতে, বিশেষ করিয়া ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মান্ধ বা ধর্ম-গোঁড়া হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুস্থ

মানসিকতা ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া যাঁহারা এই অলীর নির্দশন সমূহ।
তত্ত্ব অনুধাবন করিবার মানসে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ পঞ্চম পরিচ্ছেদ

করেন, তাঁহাদের করকমলে ত্বরিকতের একজন নগণ্য জন্মভূমির পরিচয়, জন্মভূমির বৈশিষ্ট্য, সেই সময়কার খাদেম হিসাবে সেবার নির্দশন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি বাংলাদেশ, নবযুগের সূচনা, হ্যারত ইবনে আরবীর পরিচয়, উপস্থিত করিলাম। উপকৃত মনে করিলে নিজকে পুরানা আমলে অত্র অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা, পাহাড়ীয়া কৃতার্থ মনে করিব। আশা করি, দোষ-ক্রটি নিজ গুণে শাসকদের স্মারক চিহ্নসমূহ, বিশ্ব অলীর জন্ম, নামের গুরুত্ব, ক্ষমা করিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত ১৪৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের ২ পৃষ্ঠাব্যাপি মন্তব্য।

সুচিপত্রও রীতিমতো আমাদের বিশ্ময়ের উদ্দেক করে। নবী ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আবেরুজ্জামান হয়েরত আহমদ মুজতবী মোহাম্মদ মোস্তফা বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগ বিকাশ, বেলায়তে মোত্লাকা (সং) এর বিশ্বশ্রেষ্ঠ দুই মহান সত্ত্বা নবুয়াতী ও বেলায়তি ধারা; পরিবর্তিত যুগ, বেলায়তে মোত্লাকা তৌহিদে আদ্যয়ানের এ ধারার বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে পীরানে পীর দস্তগীরের সমর্থক, ১৩৭২ বাংলা, ২৭শে চৈত্র সংখ্যা “আজদীতে” আবির্ভাব, রহানী জগতের কথা, বেলায়তে মোত্লাকা যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগোষ্ঠীর মন্তব্য।

সূচনা, মাইজভাঙ্গারীয়া ত্বরিকা প্রবর্তকের পূর্বাভাষ, জন্মভূমির সম্মত পরিচ্ছেদ

পরিচয়, বেলায়ত বিষয়ক সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, ফয়জ ও এর ফয়জ ও উহার প্রকার ভেদ, ছালেক বা খোদাপছাদীদের প্রকার প্রকারভেদে, খোদাপছাদীর প্রকারভেদে, গাউসুল আয়ম ভেদে।

মাইজভাঙ্গারীয়া বেলায়ত রহস্য এবং এর আধ্যাত্মিক অংশ পরিচ্ছেদ: বেলায়ত রহস্য

সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ, সর্বজনীনভাবে সুফিসভ্যতার কবরে ও পুকুরে পবিত্র কুরআনের পাতা নিক্ষেপ, সম্মক্ষ অপরিহার্যতা, এর আলোকে মাইজভাঙ্গারীয়া ত্বরিকার পদ্ধতি।

ব্যবহারিক কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিছুই বাদ পড়েনি। এ নবম পরিচ্ছেদ

প্রসঙ্গে একজন লেখক এবং গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে ফজিলতে রববানী, ছজিদা, মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি, মানব জ্ঞান বলতে গেলে, যে কোন আগ্রহী মননশীল পাঠক এ গ্রন্থের স্তর, সুনেত্তৃত্ব ও ধর্মসাম্য, গাউসুল আয়ম হয়েরতের উক্তি।

ভেতরে প্রবেশের পূর্বে শুধুমাত্র অভিনিবেশসহকারে সূচিপত্রটি দশম পরিচ্ছেদ

অবলোকন করলেই এ গ্রন্থের যাবতীয় বিষয়বস্তুর একটা হেদয়ত ও সফলতা, হেদয়ত পাওয়ার যোগ্যতা বা সফলতা, আকর্ষণীয় চুম্বকসার-রেখাচিত্র খুঁজে পাবেন অন্যায়েই। অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য, বেলায়তে মোত্লাকার বৈশিষ্ট্য, শরীয়ত, মজহাবে এশ্ক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নবুয়ত, বেলায়ত, গাউসিয়ত, কৃতবিয়ত, আহমদীয়ুল ও লেওয়া-ই-আহমদী।

মোহাম্মদীয়ুল মসরব, নবীয়ে ছালাছা, পীরানে পীর দস্তগীরের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ছায়েরে রহানী

প্রকার ভেদে ও স্থীরূপি, শায়খুল আকবর আল্লামা ইবনে সুফি সাধনার উদ্দেশ্য, ত্বরিকার ভিত্তি, মাইজভাঙ্গারীয়া আরবী, ছুরা বকারার ২য় ও ৩য় আয়াতের ব্যাখ্যা, ত্বরিকা, প্রেম-পন্থী সুফিদের প্রতি জুলুম, সুফিদের সত্য সাংকেতিক আলেফ, লাম, মীমের রহস্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যুগ বিবর্তন

বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের পর, বেলায়তে মোত্লাকা গাউসিয়তের প্রমাণ।

যুগের সূচনা, ফচুছুল হেকমে হয়েরত ইবনুল আরবীর বর্ণনা, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

খাতেমুল আউলিয়ার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য।

এবাদাতে মোত্লাকিয়া, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ও কোবানী, আচরাবে খোদী।

বিশ্বালীর আবির্ভাবের পূর্বাভাষ, ফচে শীচে খাতেমুল ওলদ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বা খাতেমুল অলীর পরিচয়, খাতেমুল অলীর দর্শন, খাতেমুল ছেমা বা গান বাজনা ও ইহার হেকমত, পরিশিষ্ট, অত্র গ্রন্থ

সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত।

১৪৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের ১৫টি পরিচ্ছেদে ঘুরে ফিরে যে মৌলিক বিশয়গুলো ফুটে উঠেছে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে, সর্বোপরি চলমান সমাজ বাস্তবতার আলোকে এগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি-

০১. সৃষ্টা আল্লাহু এবং সৃষ্টি আদমের অন্তর্নিহিত পারম্পরিক সম্পর্ক

০২. সাধারণভাবে সৃষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক।

০৩. মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি।

০৪. ধর্ম বিষয়ক তাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

০৫. ধর্ম প্রচার কেন্দ্রিক পর্যালোচনা।

০৬. মানব সভ্যতার অধিঃপতনের অশণী সংকেত।

০৭. ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বিশেষত্ব।

০৮. খাতেমুল আউলিয়ার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য।

০৯. যথার্থ নায়েবে রসূল পরিচিতি।

১০. ফজিলতে রববানী।

১১. সুনেত্তৃত্ব ও ধর্মসাম্য।

১২. মাইজভাঙ্গারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তকের বিশেষত্ব।

১৩. মাইজভাঙ্গারীয়া ত্বরিকার বিশেষত্ব।

১৪. বেলায়তের শ্রেণী বিভাগ।

১৫. বেলায়তে মোকাইয়্যাদার সীমাবদ্ধতা।

১৬. বেলায়তে মোত্লাকার বিশেষত্ব।

১৭. ধর্ম বিরোধ নিরসনে বেলায়তে মোত্লাকার প্রভাব।

১৮. ফকিহদের অভিমত বনাম (মুক্ত) সুফিবাদ।

১৯. সুফি সভ্যতাই দিশারী।

২০. সুফিদের সত্য সংগ্রহ পদ্ধতি।

২১. মানসিক সুস্থিতা বিষয়ক অভিমত।

২২. প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ক অভিমত।

২৩. ওহাবী, শিয়া সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গ।

২৪. ছজিদা প্রসঙ্গ।

২৫. সামা বা গান বাজনা বাজনার হেকমত।

২৬. ঢালাওভাবে সঙ্গীতকে হারাম বলা প্রসঙ্গ।

০১. সৃষ্টা আল্লাহু এবং সৃষ্টি আদমের অন্তর্নিহিত পারম্পরিক সম্পর্ক: আভিধানিক অর্থে আদম মানে ইমাম বা

সর্দারীয়ারোগ্য মাটির কঠিন স্তরে সৃষ্টি (পৃ. ৭৫) সূরা ছোয়াদ

এর ৭৫ আয়াতে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ঘোষণা- আদমকে আমি আমার নিজ দুই হাতে সৃষ্টি করেছি। পবিত্র হাদিসেও এর

সমর্থন মেলে পরিপূর্ণমাত্রায় (পৃ. ৭৫)। খালাকাল্লাহু আদমকে নিজ অবয়তায় সৃষ্টি

করেছেন। বিষয়টিকে বলা যেতে পারে এ রকম-মানুষ হলো অদ্ভুত স্রষ্টার দৃশ্যমান প্রতিকৃতি। বলাবাহ্য, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খোদায়ী ফজিলতের মাধ্যমেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত (পৃ. ৭৬)।

০২. সাধারণভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক: স্রষ্টাকে ভূলিয়ে যাওয়ার নামই দুনিয়া, সংসার সামগ্ৰী, টাকা-পয়সা ও জীপুত্র দুনিয়া নহে। (পৃ. ১৮)

০৩. মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি: এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খোদায়ী ফজিলতের মাধ্যমেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। খোদা পরিচিতি-জ্ঞান অর্জনের জন্য ইহা একাত্ম প্রয়োজন। স্রষ্টা অনুরাগ ও সৃষ্টি অনুরাগের মধ্যখানেই ইহার স্থিতি। মুরীচিকাৎসা ক্ষণভঙ্গের সৃষ্টি অনুরাগ মানবকে বিআন্তির পথে পরিচালিত করিয়া দুঃখ কষ্টে নিপত্তি করে। স্রষ্টানুরাগ মানবকে বিআন্তি ও দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি দেয় এবং তাহার আসল বস্তু স্রষ্টার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। (পৃ. ৭৬)

০৪. ধর্ম বিষয়ক তাত্ত্বিক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও ইহা বাহ্যিক যাহার নাম ধর্ম, এই ধর্ম বস্তু অভিন্নও এক। যেহেতু সমস্ত ধর্মের লক্ষ্যস্থল খোদা। যদিও বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন গোষ্ঠী সংগঠিত, ইহা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি সমূত্ত। এই মতবাদের সঙ্গে হ্যরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (ৱঃ), আ'মের ইবনুল ফারেস, হ্যরত জালালুদ্দিন রুমী (ৱঃ), হ্�যরত আবদুল করিম জিলি (ৱঃ), তাইপুরী হ্যরত আবু এজিদ বোস্তামী (ৱঃ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। (পৃ. ১৩-১৪)

জনাব গোতম বুদ্ধের মতবাদ সম্পূর্ণ একমত না হইলেও তাওহীদে আদীয়ানের বা সুফি মতবাদের সাথেও বিরোধ সৃষ্টি করে না। ইহা তাহার উপদেশাবলী হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায়। (পৃ. ১৭)

০৫. ধর্ম প্রচার কেন্দ্রিক পর্যালোচনা: বাংলাদেশে ইংরেজ ছক্ষুমত প্রতিষ্ঠার ফলে মোহাম্মদী দীন রবির দ্বিপ্রহরে মানবকুল পুনরায় বাধায় পতিত হয় এবং আল্লাহর তিরক্ষারের ঘোগ্য হইয়া পড়ে।

সামাজিক ও আচার ধর্মে রাস্তায় সাহায্যহারা মোসলেম সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন অচল ও দর্শনের সম্মুখীন হইতে থাকে। এই প্রাণহীন দুর্বল শরীয়তী ব্যবস্থা যুগে নেতৃত্ব ধর্ম প্রধান এক বেলায়েতে মোত্লাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যিকতা অপরিহার্য হইয়ে পড়ে। যেই বেলায়েতে বিধান ধর্ম ও রায়ত্বনীতি বা রেওয়াজ হইতে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়। সেই বেলায়েতের অধিকারী ব্যক্তিত

সম্পন্ন ব্যক্তিই বেলায়েতে মোকাইয়াদী যুগের খাতেম বা আহরণকারী হয়, তখন সেই ব্যক্তি ফেরেন্টাদের সজিদা সমাঞ্চকারী এবং বেলায়েতে মোত্লাকা যুগের আরভকারী, গ্রহণকারী সাব্যস্ত হয়। এ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে সজিদা করে তাওহীদে আদীয়ানের সমর্থক। তাই শায়খুল আকবর, যাঁহারা ফেরেন্টার মত হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহারা হেকারত-আল্লামা মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী এই ব্যক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে হিংসা, অবাধ্য প্রকৃতি ও সন্দেহ প্রভৃতি হইতে মুক্ত। (পৃ. ৭৬)।

০২. সাধারণভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক: স্রষ্টাকে ভূলিয়ে যাওয়ার নামই দুনিয়া, সংসার সামগ্ৰী, টাকা-পয়সা ও জীপুত্র দুনিয়া নহে। (পৃ. ১৮)

০৩. মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি: এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খোদায়ী ফজিলতের মাধ্যমেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। খোদা পরিচিতি-জ্ঞান অর্জনের জন্য ইহা একাত্ম প্রয়োজন। স্রষ্টা অনুরাগ ও সৃষ্টি অনুরাগের মধ্যখানেই ইহার স্থিতি। মুরীচিকাৎসা ক্ষণভঙ্গের সৃষ্টি অনুরাগ মানবকে বিআন্তির পথে পরিচালিত করে। স্রষ্টানুরাগ মানবকে বিআন্তি ও দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি দেয় এবং তাহার আসল বস্তু স্রষ্টার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। (পৃ. ৭৬, ৩০)

০৪. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৫. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৬. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৭. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৮. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৯. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

১০. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

১১. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

১২. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

১৩. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

মাসিক আলোকধারা

বা কর্ম পছার বেষ্টনকারী হিসাবে তিনি বেলায়তে মোহিত বা বেলায়তে মোত্লাকার মালিক, যা থেকে নিছবতাইনে আদমী বলা হয়। (পৃ. ৩৪)

বেলায়তে মোত্লাকা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণ ইহা মনে করে যে, বিভিন্ন মতবাদের (ধর্মের) মত ও পথ বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকের গত্যব্যস্থল এক। এই বেলায়ত শক্তি ধর্ম জগতেরও সমাজ জীবনের আবর্তন নির্বর্তনমূলক শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট যুগ যাহাকে বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠাতা শক্তি, সনাতন ইসলাম বলে। এই বেলায়ত, জ্ঞাব ও ছুলুকের সংমিশ্রণে ইহার অধিকারীকে নবী করিম (সঃ) এর পূর্ণ নবুয়ত ও বেলায়তের যুগলুরপ বিকাশ দান করতে সমর্থ হন। বেলায়তে মোত্লাকা যে তাওহীদে আদীয়ানের বা ধর্ম প্রত্যেকের পথে করিতে হোগে যাবে না কেন যদি তাহারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সংকার্য করে তাহার পুরুষাকার আল্লাহতালার নিকট আল্লাহতালা যে আমানত অর্পণ করেছেন তা মায়ারফত উপর আল্লাহতালা যে আমানত অর্পণ করেছেন তা মায়ারফত ও তৌহীদ, সুতরাং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এ তাওহীদ ও মায়ারফতের আমানতের বৈৰোধ বহন করে আছে।

০১. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০২. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৩. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৪. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৫. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৬. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৭. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

০৮. ধর্ম বিষয়ক পর্যালোচনা: সত্য কথা যে, যত

রকমের ধর্ম আছে অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলত অভিন্ন। (পৃ. ১১) অভিযুক্তিতে একটি মতবাদের অনুরূপ না হইলেও এই প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়া পৌছে আছে।

যায়, ইহুদীদের মত যাহারা মনে করে বেহেস্ত কেবল তাহাদের জন্য, তাহারাও এই ভুক্তির অন্তর্গত। (পঃ ৫৭-৫৮)

১৭. ধর্ম বিরোধ নিরসনে বেলায়তে মোত্তাকার প্রভাব: যেই ইবাদতে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগরিত হয় না তাহা এবাদত বা সুষ্ঠু সালাতযোগ্য নহে। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন রূপ হইলেও যেখানে এই খোদা প্রেম জাহাত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাকে সালাত বলে। ইহা বুবিতে পারিলেই ধর্ম বিরোধ মিটিয়া যাইতে বাধ্য। বিশ্ব ধর্ম বিরোধ মিটাইয়া যাইবার সময়ে সাধন করিতে বেলায়তে মোত্তাকা আহমদীই একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ। এই বেলায়তের প্রভাবেই জগত হইতে ধর্ম বিরোধ তিরোহিত হইতে পারে। (পঃ ৯০)

১৮. ফকিহদের অভিমত বনাম (মুক্ত) সুফিবাদ: বিধান ধর্মের বেড়াজাল ঠেলিয়া সামনে অগ্রসর হও। (পঃ ১০২) সুফিবাদের বিরুদ্ধে ফকীহদের বক্তব্য: অপর এক বিরুদ্ধবাদী ফকীহরা বিধান ধর্মের চর্চাকারীদের মন্তব্য হইল এই যে উপরোক্ত (সুফিবাদের) ব্যক্তিবন্দের কথাবার্তা কাজকর্ম, কোন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী না হইলেও তাহাদের মতে এই মতবাদ সুফিবাদ বা ব্যক্তি স্বাধীনতা কুরআন, হাদিস ও এজমা কেয়াছ মতে অসিদ্ধ। তাহারা চিন্তা করিতে পারেন না যে, তাহাদের প্রমাণ সংগ্রহ পদ্ধতিটি এক মৃত ব্যক্তি হইতে অপর মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত পদ্ধতি সুফিয়ায়ে কেরামগণ যাহাকে ‘খোড়া পদ্ধতি’ বলে। (পঃ ১০৯)

এইরূপ সরল বিশ্বাসী তাকলিদী প্রাণ জনগণ দোজখ, কুফরী এবং সাক্ষাত বিবি তালাকের ভয়ে সব সময় স্বত্রন্ত বিধায় সুচূরুত ভেদ, পেশা, বুদ্ধিসম্পন্ন খোদায়ী সনদবিহীন নায়েবে নবীর দাবীদারদের কথা শুনিতে বাধ্য হয়। (পঃ ১১৫)

খারেজী মাদ্রাসা হইতে নির্গত লোকদের মধ্যে কোন প্রকার অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন লোক দেখা যায় না। (পঃ ১১৬) যেহেতু তুরীকতপক্ষ শরীয়তপক্ষের পরবর্তী বিধায় লাওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর হইতে আরুত্ত হয়। তাই উপরোক্ত বাহিনীসম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টিগোলীর সঙ্গে ইহার তফাত দেখা যায়। (পঃ ১১৮)

১৯. সুফি সভ্যতাই দিশারী: মাওলানা রূমীর (৮) মসনবীর মর্মমতে, শেষ জ্যানার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার মানসে সুফিয়ায়ে কেরাম, যুগ প্রবর্তক অলি-উল্লাহ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত লোকদের অনুসরণ করা একান্ত দরকার। যাঁহারা আত্মার প্রেরণা-স্বত্ত্ব চেতনা-সজাগ; তাহাদের সম্পদ বা বৈষ্ণবিক চেতনা সুপ্ত। তাহারা সুফি সভ্যতা-সম্পন্ন দিশারী। (পঃ ৯৭)

২০. সুফিদের সত্য সংগ্রহ পদ্ধতি: সুফিয়ায়ে কেরাম জিন্দা খোদা ও জিন্দানবী এবং অলিগণ হইতে অন্তর জ্যোতির দ্বারা সত্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই পদ্ধতি নিশ্চয় নির্ভুল। তাই তাঁহারা কাহারো ভয়ে ভীত, প্রলোভনে মুক্ত বা বৈস্তুত হয় না। তাঁহারা কাহারো সম্মানেরও প্রত্যাশী

নহেন। (পঃ ১১০)

২১. মানসিক সুস্থিতা বিষয়ক অভিমত: মানুষের দৈহিক সুস্থিতা (শাসকের) রাজ-দ্বরবারে হাজির হলে তিনি চমৎকৃত হয়ে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থিতা যেমন দরকারী ও মূল্যবান মানসিক বলেন, “শায়খ, আমাকে এভাবে সম্মানিত করার ক্ষেত্রে সুস্থিতা ও দৃষ্টিগোলীর সুস্থিতাও তেমনি নিতান্ত প্রয়োজন। (পঃ: আমি এ রকম কথনে প্রত্যাশা করিন। যাঁহার অভাবে মানব দ্বীন-দুনিয়াতে বিশ্বেষণ কিংবা হয়নি। অধিকারবলে আপনার সেবক ও পরিচরবর্গের সারিতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মাঙ্গ বা ধর্মগোড়া হইতে বাধ্য হইয়া ও সাহচর্যে দিন-রাত দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত আমার। আমি তো সেটিও যোগ্য নই! এটি যে কেতো বড় সদয়ভাব।”

২২. প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ক অভিমত: যে জ্ঞান, দর্শন যুক্তি মওলানা রূমী (৮) বলেন: আপনার সুউচ্চ আধ্যাত্মিক সম্বলিত নীতির উপর রেসালত বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত তাহা আকাঙ্ক্ষা-ই এর কারণ। আপনার পদমর্যাদা যতোই উচ্চে হইল এবাদতে মোতানাফি যা ও মায়ামেলাতে এয়েতেবারিয়া বৈশ্বেষণ কাজে জড়াচ্ছেন, ততোই আপনি নিজের আধ্যাত্মিক অর্থাৎ পাপ কার্য বিরতকারী এবাদত ও পরম্পর স্বার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে নিজেকে ঘাটিপূর্ণ বিবেচনা করছেন। সম্পর্কিত কার্যকলাপ। ইহা রেসালত বা শরীয়তের প্রধান আপনি যা অর্জন করেছেন, তাতেও সন্তুষ্ট নন এ কথা তেবে স্বত্ত। (পঃ ১৬)

২৩. ওহাবী, শিয়া সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে: প্রবাদ আছে, সকল অর্জনের কোনোটি-ই ঐশ্বী (নেকট্য) অর্জনের লক্ষ্যে ওহাবীদের মধ্যে বুজুর্গ হয়না এবং শিয়াদের মধ্যে হাফেজ আপনার দৃষ্টিকে অন্ধ করতে পারছে না, সেহেতু আমার অন্তর আপনার থেদেমত করতে আগ্রহী। আর এগুলোর সব কিছুর হয় না। (পঃ ১১৬)

২৪. ছজিদা প্রসঙ্গ: আধ্যাত্মিকতা এবং জাগতিকতা তথা মহিমান্বিত করতে চেয়েছি।

খোদায়ীজ্ঞান-শক্তি বনাম খোদা জ্ঞানশূন্য আত্মস্মৃতিরাত (জিসমানী) আকৃতিরও গুরুত্ব থেকেও খায়েশ মেটানোর পীর বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অনেকে বেশি হলো এর প্রকৃত সারবস্তু। হৃদযন্ত না থাকলে লেবাসধারীদের উৎপাতে “পবিত্র ছজিদা” আজ বিভিন্নভাবে শরীরের যেমন পতন ঘটে তাকে। আপনি যদি খোসা ছাড়া বীজ বপণ করেন, প্রশ্নবিদ্ধ। এতদবিষয়ে জ্ঞান-গর্ভ তাঁত্বিক আলোচনাসমূহ স্থান পতন ঘটে থাকে। কিন্তু আপনি যদি তার খোসাসহ জন্যেই আমি আপনাকে (জিসমানী/শারীরিক) সোহৃত দ্বারা যে আপনার অনেক বেশি দায়-দায়িত্ব রয়েছে। যেহেতু এ

২৫. সামা বা গান বাজনার হেকমত: যুগ-সংস্কারক অলিয়ে এবং বড় গাছে হয় পরিণত। অতএব, আকার-আকৃতি একটি কামেলগণ মানবজ্ঞানিকে নানা প্রকার হেকমত প্রয়োগে বড় ও প্রয়োজনীয় মৌলনীতি; আর এটি ছাড়া আমাদের কর্ম আল্লাহতালার প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্যৰ্থ হয় এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-ও অর্জিত হয় না। বাদ্যযন্ত্রাদিসহকারে আল্লাহ রাসূল ও অলি-আল্লাহর শানে হ্যাঁ, এই মৌলনীতি সেসব (পুণ্যাত্মা) ব্যক্তির কাছে বাস্তবতা, গজল-নাতীয়া ইত্যাদি ছন্দে-বন্দে গাহিয়া আল্লাহ-রাসূলের যাঁরা বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন এবং যাঁরা নিজেরাই বাস্তবতায় প্রেম প্রেরণা জাগাইয়া বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ‘জিকিরে জলী’ এক দরবেশে একবার কোনো রাজার দরবারে উপস্থিত হন।

বা খৰ্ফী’ করাকে কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য হেকমত রাজা তাঁকে সমোধন করেন, “ওহে ফকির।” দরবেশ জবাব দেন, “আপনি-ই তো ফকির।” এমতাবস্থায় রাজা জানতে প্রয়ৰ্ত্ত করেন। (পঃ ১৩১)

২৬. ঢালাওভাবে সঙ্গীতকে হারাম বলা প্রসঙ্গ: নির্দোষ গান-চান, “আমি কীভাবে ফকির হতে পারি, যেখানে সারা পৃথিবী বাজনা কোন ধর্মে নিষেধ নাই। তবুও মৌলভী সাহেবন সর্ব আমার মালিকানাধীন!” দরবেশে উত্তর দেন, “আপনি প্রকার গান বাজনা মোটামুটিভাবে এক তরফাভাবে নিষেধ সবকিছুর উল্টোটি দেখে থাকেন। এ দুনিয়া ও পরবর্তী জগতের যতো কিছুর মালিক হওয়ায় সঙ্গে, তার সবই আমার মালিকানাধীন। আমি সমস্ত দুনিয়া লুকে নিয়েছি। আপনি-ই বরং এক ধাস (খাবার) ও এক টুকরো কাপড়ে সন্তুষ্ট

ফীরি মা ফীরি (মওলানা রূমীর উপদেশ বাণী)

থেকেছেন।”

আপনি যেদিকেই তাকান, খোদাতালার চেহারা মোবারক (রূপকার্ত্তে) আপনার সামনে উপস্থিত। এ মোবারক চেহারা অনাদি ও অনন্ত। আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত আশেক-ভঙ্গবন্দ ওই পবিত্র চেহারার জন্যে আত্মোস্র্গ করেন, আর এর প্রতিদানস্মরণ তাঁর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। বাকি মন্যকুল হচ্ছে গরুর পালের মতো। মানবজ্ঞাতির বাকি অংশ যদিও গরুর পালের মতো, তবু তারা (খোদায়ী) দানের যোগ্য। তারা হয়তো আস্তাবলে বসবাস করতে পারে, কিন্তু ওই আস্তাবলের মালিক/প্রভু কর্তৃ তারা গৃহীত (মকবুল)। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাদেরকে এই আস্তাবল থেকে নিজের খাস (নিজস্ব) খোঁয়াড়ে স্থানান্তর করতে পারেন। অতএব, সব কিছুর সূচনায় খোদাতালা পুরুষ ও নারী জাতিকে অস্তিত্বলীল করেন; অতঃপর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের খোঁয়াড় থেকে তাদেরকে অচেতন জগতে স্থানান্তর করেন; এরপর অচেতন জগতের খোঁয়াড় থেকে উত্তিদেজগতে স্থানান্তর করেন; উত্তিদেজগত থেকে প্রাণিগতে; অতঃপর প্রাণি হতে মানবে, মানব হতে ফেরেশতায়; আর এভাবেই চলবে এ প্রক্রিয়া চিরকাল। তিনি এ সকল আকার-আকৃতির বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যাতে আপনি জানতে পারেন যে তাঁর খোঁয়াড় অগণিত, আর এগুলোর একেকটি অপরটি হতে উচ্চতর (বা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন)। [বি: দ্ব: মওলানা রূমী (৮)-এর এই বক্তব্য আউলিয়াবুল্দের কাশফ-মুকাশাফা। এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয় অনুবাদক।]

আল্লাহ পাক বর্তমান এ দুনিয়া প্রকাশ করেছেন বা মেলে ধরেছেন যাতে আপনি পরবর্তী যেসব পর্যায় বা ধাপ অপেক্ষা করছে, সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন। তিনি এমনভাবে প্রকাশ করেননি যাতে আপনি বলতে পারেন, “এখানে যা আছে এ পর্যন্তই (সব কিছুর শেষ)।” কোনো শিল্প-কৌশলের মহাকারিগর তাঁর কারিগরি দক্ষতা ও যোগ্যতা নিজ শিক্ষানবিশ্বের সামনে মেলে ধরেন যাতে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং তাঁর অপ্রদর্শিত অন্যান্য শিল্পেও বিশ্বাস করেন। কোনো রাজা তাঁর প্রজা সাধারণের প্রতি সমানসূচক জুরু ও উপহারসমূহী দান করে থাকেন; কেননা তারা তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য উপহারের আশায় থাকেন এবং ভবিষ্যতে স্বর্গের থলে লাভের আকাঙ্ক্ষায় পিছু লেগে থাকেন। তিনি এগুলো মঞ্জুর করেন না তাদেরকে এ কথা বলার জন্যে, “এখানে যা আছে এ পর্যন্তই (সব কিছুর শেষ); রাজা মহাশয় আর কোনো আশীর্বাদ দারা আমাদের ধন্য করবেন না”, এবং ওই মঞ্জুর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার জন্যে। রাজা মহাশয় যদি জানেন কোনো প্রজা এ কথা বলতে পারেন এবং ওই উপহার

নিয়েই তুষ্ট থাকেন, তাহলে তিনি কখনোই কোনো উপহারসমূহী তাদেরকে দান করবেন না।

ফকির সে ব্যক্তি যিনি পরবর্তী জগতকে দেখতে পান। আর দুনিয়াদার দেখে কেবল আস্তাবল। কিন্তু খোদাতালার মনোনীত/পছন্দকৃত জন যাঁর কাছে রয়েছে প্রকৃত (ঐশ্বী) জ্ঞান, তাঁর লক্ষ্য কিন্তু পরকাল নয়, আস্তাবল-ও নয়। তাঁর লক্ষ্যস্থির রয়েছে প্রথম (মৌল) নীতিতে, মানে সকল বস্তুর উৎসের (অর্থাৎ, খোদার) দিকে। পছন্দকৃত জনের যখন গমের বীজ বপন করেন, তখন তাঁরা জানেন যে গম ফলবে; কেননা তাঁরা সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত দেখতে পান। একই রীতিতে যব ও চাল এবং সব কিছুর বেলায় আরম্ভ দেখে তাঁদের দৃষ্টি সমাপ্তির দিকে নিবন্ধ নয়। তাঁরা সূচনা থেকে সমাপ্তি সম্পর্কে জানেন। ওই রকম পুরুষ ও নারী বিবর।

বেদনা-ই আমাদেরকে সকল (সাহসী) উদ্দেশ্যে পথ দেখিয়ে থাকে। যতোক্ষণ না নিজের ভেতরে কোনো ব্যথা, উৎসাহ ও কাম্য বস্তুর জন্যে কোনো আকাঙ্ক্ষা জাহাত হয়, ততোক্ষণ আমরা তা অর্জনে সংগ্রাম করি না। বেদনা ছাড়া তা আমাদের নাগালের বাইরে থাকে, চাই তা হোক এ দুনিয়াতে সাফল্যলাভ, কিংবা হোক পারলৌকিক পরিবার; অথবা চাই আমাদের লক্ষ্য হোক কোনো সওদাগর বা রাজা, কোনো বিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার। হ্যবরত মরিয়ম (আঃ)-এর প্রসববেদনা দেখা দেয়ার পরপরই তিনি ওই গাছের দিকে গিয়েছিলেন। ওই ব্যথা তাঁকে গাছের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আর যে গাছ গিয়েছিল শুকিয়ে, তাতেই ফল উৎপন্ন হয়েছিল।

আল-কুরআনে বর্ণিত মরিয়ম (আঃ)-এর কাহিনীর মতোই হচ্ছি আমরা। আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যেই একজন ঈসার আছেন। কিন্তু বেদনার বহিপ্রকাশ না হলে আমাদের সে সন্তান যে গোপন পথে এসেছিল, সেই একই পথ ধরে উৎসে ফিরে যাবে; আর আমরা শূন্য হয়ে পড়ে থাকবো, আমাদের প্রকৃত সন্তান জন্ম হবে না।

“অভুত তোমার অন্তঃস্থ আত্মা
অতিভোজনরত তোমার বাইরের চামড়া
শয়তানের রাঙ্কুসে-ভক্ষণে পেয়েছে অসুস্থতা
রাজা তাই রুটির জন্যেও করছেন ভিক্ষা
নিরাময়প্রাপ্তি তখনই যদি এ ধরায় থাকেন দুসা’
কিন্তু একবার তাঁর হলে আসমানে ফেরা
ফুরিয়ে যাবে সব আশা-ভরসা।”

উপদেশ বাণী- ৬

মওলানা রমী (রহঃ) বলেন: এসব কথা তাদের উদ্দেশ্যে বলা, যাদের বোবার জন্যে কথা বলতে হয়। কিন্তু যাঁরা কথা ছাড়া বুবাতে পারেন, তাঁদের আবার ভাষণের কী প্রয়োজন? তাঁদের কাছে বার্তা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যেগুলো নিজেরাই খোদায়ী কালামের (মানে ঐশ্বী ভাষণের) বহিপ্রকাশ। ফিসফিস করে বলা কথা যিনি-ই শুনতে পান, তাঁর আবার চিক্কার-চেঁচমেচির কী প্রয়োজন?

একবার এক আরবী-ভাষী কবি কোনো এক রাজার সামনে সামাজিক অবস্থানেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য, যা এমন কি হাজির হন। রাজা ছিলেন তুর্কী, আর তিনি এমন কি ফারসী- তাঁদের কথা ও কাজেও বিদ্যমান, তথাপি তাঁদের সবার লক্ষ্য ও (পারসিক ভাষাও) জানতেন না। ওই কবি তাঁর সম্মানে একই, আর তা হলো খোদাতালার (নেকট্য) তালাশ বা কিছু চমৎকার আরবী কবিতার পঞ্চিক রচনা করেছিল এবং অম্বেষণ।

তা সাথে করে নিয়েও এসেছিলেন। রাজা সিংহাসনে বসার বাতাসের উদাহরণ-ই ধরা যাক। কোনো বাড়ির ভেতর দিয়ে পর এবং রাজ-দরবারের আমীর-অমাত্যবর্গ, মন্ত্রী ও বইতে শুরু করলে এটি কাপেটি বা গালিচার কেণাগুলো সেনাপতিমণ্ডলী তাঁদের নিজ নিজ আসনে যথারীতি বসার পর উড়িয়ে নেয় এবং গালিচা ঝাপটাতে থাকে, আর নড়াচড়াও কবি ওঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করেন। করতে থাকে। এটি কাঠি ও খড়কে দ্রুত শুন্যে তোলে; হাউজ অভিনন্দনযোগ্য প্রতিটি কবিতার অংশের শেষে রাজা মহাশয় বা জলাধারের পানিপৃষ্ঠে আলোড়ন তোলে যতোক্ষণ না তা মাথা নাড়েন, আর বিশ্বায়ের উদ্বেক হয় এমন প্রতিটি কবিতার দেখতে লাগে কোনো প্রাণির প্রতিরক্ষামূলক বিহিরাবরণের অংশে তাঁকে বিশ্যাভিভূত দেখা যায়। একইভাবে, সমর্পণ- মতো; গাছ-গাছালি, তার ডালপালা ও লতাপাতাকেও করে জাপক প্রতিটি কবিতার অংশেও তিনি যথাবিহিত অভিযুক্তি এটি আন্দোলিত। এ সব পরিস্থিতি দৃশ্যতঃই স্পষ্ট ভিন্নতা প্রকাশ করেন। রাজ-দরবারের সভাসদবর্গ সবাই এতে বহন করে, কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বেলায়, উৎস ও বিশ্যাবিষ্ট হন।

বাস্তবতার ক্ষেত্রে সেগুলোর সবেই একটি নিয়ামক, আর তা সভাসদবৰ্দন নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, হলো বায়ু প্রবাহ। কেউ একজন বলেন: “আমি প্রকৃত ‘আমাদের রাজা মহাশয় আরবী একটি শব্দ-ও জানতেন না, উদ্দেশ্যকে অবহেলা করেছি।”

তাহলে কীভাবে এটি সম্ভব হলো যে তিনি এতে সঠিকভাবে মওলানা রূমী (রহঃ) জবাবে বলেন: যখন এ চিন্তা কোনো মাথা নাড়ে সক্ষম হলেন? তিনি নিশ্চয় এতেগুলো বছর মানুষের মস্তিষ্কে উদয় হয় এবং তার নিজেদের সমালোচনা যাবত আরবী টিকই জানতেন, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তা করে বলে, ‘আমি কী, কেন এসব কাজ করি?’ যখন এ রকম গোপন রেখেছিলেন। আমরা যদি ওই সময়কালে কখনো হয়, তখন এটি নিশ্চিত প্রমাণ যে খোদাতালা তাদেরকে আরবীতে অশিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে থাকি, তাহলে আফসোস ভালোবাসেন এবং তাদের ব্যাপারে যত্নবান। কবি যেমনটি আমাদেরই!”

বলেন- “তিরক্ষার চলে যতোদিন, প্রেমও ততোদিন।” আমরা এদিকে রাজার এক পছন্দের গোলাম ছিল। সভাসদবর্গ একত্র আমাদের বন্ধনেরকেই তিরক্ষার করি, কিন্তু কখনো অপরিচিত হয়ে তাকে একটি ঘোড়া, একটি খচর ও অর্থকর্ডি দান করেন কাউকে তিরক্ষার করি না।

এবং অনুরূপ পরিমাণ আবার দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তবে তিরক্ষারেও বিভিন্ন মাত্রা আছে। যখন কেউ এর তাঁর তাকে বলেন, “শুধু এতেকুর জানতে চেষ্টা করো যে দেশেমে আক্রান্ত হয় এবং এতে সত্য উপলব্ধি করে, তখন তা রাজা মহাশয় আরবী জানেন কি-না। যদি না জানেন, তাহলে খোদার এক নিদর্শন হয় যে তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এটি কীভাবে সম্ভব হলো যে তিনি সঠিক সময়ে মাথা এবং তাদের প্রতি যত্নবান আছেন। কিন্তু যদি তিরক্ষার ওই নাড়ুলেন? এটি কি কোনো অলোকিক ঘটনা? না-কি ঐশ্বী ব্যক্তির পাশ দিয়ে চলে যায় আর সে কোনো ব্যথা অনুভব না অনুপ্রেণা বা প্রত্যাদেশ?”

করে, তবে এটি প্রেমের কোনো চিহ্ন-ই নয়। কোনো অবশ্যে একদিন ওই গোলাম তার সুযোগ পেয়ে যায়। রাজা গালিচাকে ধূলোমুক্ত করার জন্যে (বাঢ়ু দ্বারা) বাড়ি দিলে মহাশয় শিকার থেকে ফিরেছিলেন, আর গোলাম দেখতে পায় বুদ্ধিমান মানুষেরা তাকে তিরক্ষার আক্ষয় দেন না। কিন্তু যে তিনি উৎকুল্লিচিত; কেননা তাঁর শিকার অভিযান সফল কোনো নারী তার আপন শিশুকে মারলে তাকে তিরক্ষার বলা হয়েছিল। তাই গোলাম সরাসরি প্রশঁস্তি উত্থাপন করলে রাজা হবে এবং এতে তার শিশুর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ মেলে। মহাশয় অত্যাসিতে ফেটে পড়েন।

অতএব, তোমার নিজের মধ্যে যতোক্ষণ তুমি ব্যথা ও অতঃপর রাজা মহাশয় বলেন, “আল্লাহর নামে শপথ, আমি অনুভাপ খুঁজে পাও, খোদাতালার প্রেম ও হেদয়াতের আরবী জানি না। মাথা নাড়ুনো ও অভিনন্দন জানানোর প্রমাণবহ হবে তা।

ব্যাপারটি আর কিছু নয়, আমি জানতাম ওই কবির কবিতা তোমার ভাই বা বোনের মাঝে দোষ তুমি খুঁজে পেলে তাদের লেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; তাই আমি মাথা নেড়েছি এবং মাঝে দেখতে পাও তা তোমার নিজের মধ্যেই অভিনন্দন জানিয়েছি।” অতএব, এটি বোধগ্য হয় যে নিহিত। প্রকৃত সুরি দরবেশ আয়নাসদৃশ যাঁতে তুমি তোমার বিষয়বস্তুর মূল ছিল কাঞ্চিত উদ্দেশ্য; কবিতাটি ছিল দ্রেক নিজের চেহারা-ই দেখতে পাও। কেননা, “ঈমানদার ব্যক্তি ওই উদ্দেশ্যেরই একটি শাখা। ওই উদ্দেশ্য যদি না হতো, হলেন তাঁর ঈমানদার ভাইয়ের জন্যে আয়নাসদৃশ।”

মাঝে ওই সব দোষক্ষণ্টি দূর করো! কারণ তাদের মধ্যেও তোমাকে বিরক্ত হবে। দ্বিতীয় শাখা-প্রশাখা প্রদর্শন করে, কিন্তু মূল (উৎস) করে। একটি হাতিকে পানি পানের উদ্দেশ্যে কোনো এক একটি-ই। সুরি-শায়খবন্দের ক্ষেত্রেও একই কথা। বাহ্যতঃ কুয়োর ধারে নেয়া হয়। কিন্তু জলের মাঝে সে নিজের চেহারা যদিও তাঁদের রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি, আর তাঁদের দেখে ভয়ে (বা বিরত হয়ে) সরে যায়। সে মনে করেছিল সে

অন্য এক হাতি দেখে সরে গিয়েছিল, কিন্তু বুবাতে পারেনি সে নিজেরই কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।

সকল মন্দ বৈশিষ্ট্য, যেমন- অন্যায়, ঘৃণা, দীর্ঘ, লোভ, নিষ্ঠুরতা, অহঙ্কার ইত্যাদি যখন তোমার নিজের মধ্যে থাকে, তখন তা কোনো বেদনার উদ্বেক করে না। কিন্তু যখন তা তুমি অন্যদের মাঝে দেখতে পাও, তখনই সরে যাও এবং ব্যথা অনুভব করো। আমরা আমাদের নিজেদের (ক্ষতস্থানের) মাঝড়ি ও পুঁজুকু ফেঁড়ির ব্যাপারে বিরক্ত হই না। আমাদের খাবারে নিজেদের সংক্রমিত হাত দুকিয়ে সামান্যতম রোগকাতুরে না হয়েই তা (যুথে নিয়ে) চাটতে পারি। কিন্তু যদি আমরা অন্য কারো হাতে ছেটাই একটি পুঁজুকু ফেঁড়া বা আঁচড় দেখতে পাই, তৎক্ষণাত আমরা ওই ব্যক্তির খাবার থেকে দূরে সরে যাই এবং তা খাওয়ার প্রতি আর কোনো আগ্রহ আমাদের থাকে না। মন্দ স্বত্বাও বৈশিষ্ট্য হলো (ক্ষতস্থানের) মাঝড়ি ও পুঁজুকু ফেঁড়ির মতোই; সেগুলো যখন আমাদের মধ্যে হয়, তখন কোনো ব্যথার কারণ হয় না, কিন্তু যখন সেগুলো অল্প মাত্রায়ও অন্য কারণে আমরা দেখতে পাই, তখন-ই আমরা ব্যথা ও বিরক্তির অনুভব করি।

তোমার ভাই বা বোনের কাছ থেকে তুমি যেমন দূরে সরে যাও, তেমনি তারাও তোমার কাছ থেকে তোমার কামড় অনুভব করে। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে হয় এবং তখন কোনো ব্যথার কারণ হয় না, কিন্তু যখন সেগুলো অল্প মাত্রায়ও অন্য কারণে আছে তাই একই দোষক্ষণ্টির কারণেই (অনুভূত) হয়েছে, আর তারাও একই দোষক্ষণ্টি দেখতে পায়।

সত্যান্বেষী ব্যক্তিবর্গ হলেন তাঁদের প্রতিবেশীদের আয়নাসদৃশ। কিন্তু যারা সত্যের কামড় অনুভব করতে অক্ষম, তারা অন্য কারো জন্যে আয়না নয়, শুধু নিজেদের ছাড়া।

কোনো এক রাজা মন্দক্ষণ হয়ে একটি নদীর পাড়ে বসেছিলেন। সেনাপতিমণ্ডলী তাঁর ভয়ে ছিলেন তটস্থ। তাঁর যাই চেষ্টা করেন না কেন, রাজার চেহারার মলিনতা আর কাটে না। তবে রাজার ছিল এক অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ভাঁড়। সেনাপতিমণ্ডলী তাকে টাকা দেয়ার ওয়াদা করেন যাতে সে রাজার মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়। অতঃপর ওই ভাঁড় রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে হাসাতে চেষ্টা করে; কিন্তু সব চেষ্টার পরও রাজা এমন কি তার চেহারার দিকেও তাকাননি। তিনি শুধু নদীর দিকেই তাকিয়ে থাকেন এবং মাথাও তোলেননি।

এমতাবস্থায় ভাঁড় রাজাকে জিজেস করে, “নদীর পানিতে আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন?” রাজা বলেন, “আমি এক অবিশ্বাস ত্বরীর শাখাকে দেখতে পাচ্ছি।” ভাঁড় বলে, “হে দুনিয়ার রাজা, আপনার এ গোলামও অদ্ব নয়।” ঠিক তেমনটি-ই হচ্ছে তোমার নিজের বেলায়। তুমি যদি তোমার স্বজাতি কারো মাঝে কেনে কিছু দেখে ব্যথিত হও, তবে তারাও একদম অদ্ব নয়। তারাও তা দেখে যা তুমি দেখো। খোদার সামনে বা উপস্থিতিতে দুটি আমির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তুমি (একাধাৰে) নিজের সন্তা ও খোদাতালার

সত্তা মোবারককে জানতে সক্ষম নও; হয় তোমাকে তাঁর সামনে মৃত্যুবরণ করতে হবে, নয়তো খোদাকে তোমার সামনে মরতে হবে যাতে দ্বিতীয় না থাকে। কিন্তু খোদাতাঁ'লার মৃত্যু অসম্ভব ও ধারণাতীত, কেননা তিনি চিরজীব সত্তা। তিনি এতেটাই দয়াপ্রেরণ যে যদি কোনোভাবে সম্ভব হতো, তবে তিনি তোমার খাতিরে মৃত্যুবরণও করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু তা অসম্ভব, সেহেতু তোমাকে মৃত্যুবরণ (মানে নফস-এর লয় সাধন) করতে হবে যাতে খোদাতাঁ'লা নিজেকে তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারেন, আর দ্বৈতাও দূর হতে পারে।

দুটি পাখিকে এক সাথে বাঁধো, তাদের (উড়ার ক্ষেত্রে) সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের দুটি করে পাখাকে চারটিতে রূপান্তরের পরও তারা উড়বে না। এটি এ কারণে যে তাতে দ্বিতীয় বিরাজমান। কিন্তু একটি পাখিকে জীবন দিতে দাও, তখন অপর পাখিটি প্রথমটির সাথে বাঁধো থাকা সত্ত্বেও উড়বে; কেননা দ্বৈততা তখন দূর হয়ে গিয়েছে।

(হ্যারত) শামস-এ-তাবরিয় (রহঃ) ছিলেন আল্লাহতাঁ'লার এক (খাস) বান্দা যিনি কোনো বন্ধুর খাতিরে জীবন উৎসর্গ করতে সমর্থ ছিলেন। তিনি ওই বন্ধুর জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন, কিন্তু মহান প্রভু তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেননি। এক (গায়েবী) কর্তৃস্বরকে বলতে শোনা যায়, “আমি চাই না তুমি তাকে সাহায্য করো।” হ্যারত শামস, ওই সূর্য-সত্তান (শামস-এ-তাবরিয় অর্থ তাবরিয় নগরীর সূর্য), তাঁর ফরিয়াদে অটল থাকেন এবং বারবার আরয় করেন এই বলে, “হে খোদা! আপনি ইই ওই বন্ধুর জন্যে (অন্তরে) এ শুভকামনা সন্নিবেশিত করেছেন, এ তো আমাকে ছেড়ে যাবে না।” অবশ্যে গায়েবী কর্তৃস্বর বলেন, “তুম কি এ বিধান জারি হতে দেখতে চাও? তাহলে আত্মোৎসর্গ করো এবং শূন্যে পরিগত হও। অপেক্ষা করো না, এ দুনিয়াকে পেছনে ফেলে এসো।” হ্যারত শামস (রহঃ) জবাবে বলেন, “ওহে প্রভু, আমি তাতে রাজি (সন্তুষ্ট)।” তিনি তা-ই করেন; ওই বন্ধুর জন্যে তিনি নিজের জীবন বাজি রাখেন, আর তাঁর শুভকামনা চরিতার্থ হয়। [আরবেরীর নেট: এ কাহিনিতে বন্ধুটি হলেন মওলানা জুমী (রহঃ) ব্যয়। মওলানার দীর্ঘপ্রায়ণ ভক্ত-অনুরক্ত অনুসারীরা হ্যারত শামস (রহঃ)-কে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মওলানা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কথিত আছে, ওই সকল দীর্ঘপ্রায়ণ ভক্ত ও মওলানার নিজের ছেলেদের একজন হ্যারত শামস (রহঃ)-কে পরবর্তীকালে শহীদ করে। মওলানা জুমী (রহঃ) তাঁর হারানো পীর ও মোর্শেদ হ্যারত শামস (রহঃ)-এর তালাশ করে তাঁকে নিজের মধ্যেই খুঁজে পান; এই উপলক্ষ্য-ই মওলানার অনেক কবিতা রচনার উৎস।]

খোদাতাঁ'লার কোনো বান্দা যদি নিজের জীবন উৎসর্গ করার মতো এ ধরনের (খোদাপ্রদত্ত) করণার অধিকারী হতে পারেন, যে জীবনের (মাত্র) একদিনের অংশ গোটা দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত (প্রাণিগুলের) জীবনের সমান, তাহলে ওই করণার যিনি (মূল) উৎস (মানে খোদাতাঁ'লা),

তিনি কি এ মহবতের অধিকারী নন? এর পরিপন্থী চিন্তা তোমাদের অন্তরঙ্গলো ওসব কথায় পূর্ণ! বস্তুতঃ তোমাদের করাই অযৌক্তিক হবে। কিন্তু যেহেতু খোদাতাঁ'লার পক্ষে অস্ত্র তোমাদের নিজেদেরই অপবাদের ফিসফিসানি ও মিথ্যে মৃত্যুবরণ করা অসম্ভব, অন্ততঃ তোমার পক্ষে তো তা সম্ভব। আতঙ্গরিতায় পূর্ণ। তোমরা পুরোপুরি মোহাচ্ছন্ন ও লোভে এক নির্বাধ লোক এসে কোনো এক মহান দরবেশের বসার পূর্ণ। না, তোমরা বৰঞ্চ অভিসম্পাতেই পূর্ণ।”

স্থানের চেয়ে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হলো। সুফি-দরবেশদের আহা, তারা যদি এরকম অর্থাত্মান প্রলাপ হতে মুক্ত হতে জন্যে এতে কী আসে যায় যদি কেউ প্রদীপের ওপরে বা নিচে পারতো! তাহলে তারা (সুফি-দরবেশের) ওসব বাণী গ্রহণের অবস্থান করে? প্রদীপ যদি উচ্চতে উঠতে চায়, তবে তা তার জন্যে উন্মুক্ত হতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা গ্রহণের জন্যে তারা নিজের খাতিরে কামনা করে না। বৰঞ্চ তা অন্যদের মঙ্গলের উন্মুক্ত নয়। খোদাতাঁ'লা তাদের কান, চোখ ও অন্তরঙ্গলোতে খাতিরেই উদ্দেশ্যকৃত; যাতে তারা ওই আলো হতে তাদের মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তাদের চোখ সবকিছু উল্লো নিজ নিজ অংশ পায়। ওপরে বা নিচে, প্রদীপ যেখানেই দেখছে; তারা জানের কথাকে ছাইপাশ ও প্রলাপ হিসেবে অবস্থিত হোক না কেন, তা তবুও চিরহাস্তী সুর্যের (রংপকাৰ্যে শুনছে)। তাদের অস্ত্র আত্মপ্রেম ও অহমিকার আবাসস্থলে খোদাতাঁ'লার) প্রদীপ। ওই দরবেশ দুনিয়াবী পদমর্যাদা ও পরিগত হয়েছে। শীতকালের (কুয়াশাচ্ছন্ন) কালো আঁধারি ও আভিজাত্য তালাশ করলেও তা এ উদ্দেশ্যেই অব্যৈষিত: অহঙ্কার তাদের ওপর ভর করেছে। তাদের অস্ত্র ঠাণ্ডা ও সুফি-দরবেশবৃন্দ দুনিয়ার পদমর্যাদা ও আভিজাত্যের মোহ শক্ত বৰফ দ্বারা কঠিন হয়ে গিয়েছে। “আল্লাহতাঁলা তাদের দ্বারা সেসব দুনিয়াদার লোকদের ফাঁদে ফেলেন, যারা তাঁদের অস্ত্রে ও শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তাদের (বুর্যগ্রামগুলী) প্রকৃত উচ্চ-মকাম বা মর্যাদা দেশন বা উপলক্ষ্য চোখে পড়েছে এক পর্দা।” [সরাসরি অনুবাদ]

করার সামর্থ্য রাখে না। এরই মাধ্যমে দুনিয়াদার লোকেরা এ বাণী ওই সব লোকের জন্যে কতোই না সত্য! তারা তো হয়তো উচ্চতর (তথা উন্নত আধ্যাত্মিক) জগতের পথ খুঁজে কখনো এসব কথার (মানের) এক বলকও দেখতে পায়নি।

তারা বা তাদের উপাস্যার অধিবা তাদের হতভাঙ্গা পরিবার-একইভাবে মহানবী (দ: মক্কা মোয়ায়মা ও আশপাশের সদস্যরা তাদের সারা জীবনে এর এক ফেঁটাও স্বাদ গ্রহণ অঞ্চল জয় করেছিলেন এ কারণে নয় যে, তাঁর এগুলোর করেনি। পরওয়ারদেগুর-এ-আলম সবাইকেই একটি কলস প্রয়োজন ছিল। তিনি তা জয় করেছিলেন (তাতে) জীবনদান দেখান। কাউকে কাউকে তিনি তা পানিপূর্ণ দেখান, আর করতে এবং সকল মানুষকে আলো (নূর) দ্বারা আলোকিত তাঁর তেষ্ঠা না মেটা পর্যন্ত জলপান করেন। কিন্তু খোদাতাঁ'লা করতে। “এ মোবারক হাত অভ্যন্ত শুধু করতে দান, নয়কো কাউকে কাউকে আবার পানিশূন্য কলস প্রদর্শন করেন। খালি অভ্যন্ত করতে গ্রহণ।” সুফি-দরবেশবৃন্দ মানুষদেরকে টোপ কলসের জন্যে কেউ কী-ই বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে? দেন কেবল তাদেরকে বড় বড় এনাম/পুরুষের বা দান মঞ্জুর খোদাতাঁ'লা যাঁদেরকে পানিপূর্ণ কলস প্রদর্শন করেন, শুধু করতেই, কোনো কিছু কেড়ে নিতে নয়।

তাঁরাই এ ঐশ্বীদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে সক্ষম কেউ যখন ছোট ছোট পাখি খাওয়ার উদ্দেশ্যে বা বিক্রি হন।

জন্যে ফাঁদ পেতে সেগুলো ধরে, তখন তাকে ধূর্তা বলা

উপদেশ বাণী-৭

হয়। কিন্তু যদি কোনো রাজা একটি অপ্রশিক্ষিত ও মূলাছীন আমীর (শাসক)-এর পুত্র মওলানা জুমী (রহঃ)-এর দরবারে বাজপাখি, যার নিজের আসল প্রকৃত সম্পর্কে কোনো জাননই প্রবেশ করেন। মওলানা বলেন: আপনার বাবা সব সময়-ই নেই, তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতেন এবং তাকে নিজের আল্লাহর ধ্যানে ব্যস্ত। তাঁর আকীদা-বিশ্বাস পরিপূর্ণ এবং তাঁর (শহী) বাহু দ্বারা উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করার উদ্দেশ্যে কথাবার্তায় তা প্রতিফলিত হয়। একদিন আপনার বাবা প্রশিক্ষণ দেন, এমতাবস্থায় তাঁর এ কাজকে ধূর্তা বলা যায় বলেন, “রোম (আসলে তুরস্কের কেনিয়া) অঞ্চলের না। বাহ্যতঃ তা ধূর্তাপূর্ণ দেখা গেলেও প্রক্তপক্ষে তা যত্ন অধিবাসীবৃন্দ আমাকে তাকিদ দিয়েছেন যাতে আমি আমার ও মহানুভবতা, ম্তের মাঝে প্রাণের সংঘার, নিকৃষ্ট পাথরকে কল্যাণ করিব। এর ফলে হীরে-জহরতে রূপান্তর এবং তারও উর্ধ্বে কোনো কিছু বলে আমাদের ধর্ম একই ধর্মে পরিণত হবে, আর মুসলমানদের জাত হবে।

এই নতুন ধর্ম-ও অদ্যশ্য হয়ে যাবে।”

বাদশাহ যে উদ্দেশ্যে বা কারণে বাজপাখিকে আটক করতে আমি (আমীর) বল্লাম: “ধর্ম কবে এক হয়েছে? সব সময়-ই চেয়েছেন তা যদি বাজপাখি জানতো, তাহলে তার টোপের দুই বা তিনটি ধর্ম বিদ্যমান ছিল, আর তাদের মধ্যে প্রয়োজন পড়তো না। তখন সেটি জান-প্রাণ দিয়ে ওই ফাঁদের যুদ্ধবিহু-ও সর্বদাই লেগে ছিল। সব ধর্মকে কীভাবে এক তালাশ করতো এবং (স্বেচ্ছায়) রাজার (শাহী) হাতে উড়ে করার আশা করছেন আপনারা? একমাত্র প্রকালেই তথা পুনরুত্থানেই তা এক হবে। বর্তমান এ দুনিয়ায় এটি সম্ভব এবং সমস্তে।

মানুষেরা কেবল সুফি-দরবেশবৃন্দের বাণীর বাহ্যিক তাৎপর্যের নয়, কেননা প্রতিটি ধর্মেরই আলাদা আলাদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিকেই খেয়াল করে বা সেগুলো শোনে। তারা বলে, “আমরা বিরাজমান এবং সেগুলোর রূপরেখাও ভিন্ন।” এগুলো প্রচুর শুনেছি। আমাদের অস্ত্র এ ধরনের কথায় এখনে ঐক্য অসম্ভব ব্যাপার। পুনরুত্থানের সময়েই কেবল তরা।” আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ মাফ করুন এ থেকে যে তা সম্ভব হবে, যখন মানব সমাজ এক (কাতারবদ্ধ) হবে

এবং একটি স্থানের দিকেই তাদের দৃষ্টিকে স্থির রাখবে, আর সবার হবে একটি কান ও একটি জিহ্বা।”

আমাদের ভেতরে অনেক বস্তু বাস করে এবং আমাদের মধ্যে রয়েছে ইন্দুর, আবার রয়েছে পাখিও। একদিকে পাখি (দেহ-ই) খাঁচাটি ওপরে বহন করে নিয়ে যায়, অপরদিকে পাখি ইন্দুর নিচের দিকে টানে। আমাদের ভেতরে একটে বাস করে এমন-ই এক লাখ ভিন্ন জাতের বন্য জন্ম-জানোয়ার; তারা সবাই সম্ভবে হবে ওই মুহূর্তিতে, যখন ইন্দুর বা পাখি তার আপন সত্ত্ব ত্যাগ করবে, আর সবাই এক হবে। কেননা, লক্ষ্য যে পরে ওঠা বাঁধো নামা নয়। লক্ষ্য যখন নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবে, তখন তা ওপরে কিংবা নিচে হবে না।

কোনো নারী তার কোনো জিনিস হারিয়েছে। সে ডানে, বাঁয়ে, সামনে ও পেছনে তাকায়। একবার তা পেয়ে গেলে সে ওপরে, নিচে, ডানে, বাঁয়ে, সামনে বা পেছনে, কোনো দিকেই আর খোঁজ করে না। তৎক্ষণাত্ম সে শাস্ত ও সৌম্যভাব ধারণ করে। অনুরূপভাবে, পুনরুত্থান দিবসেও সকল মানুষের একই চোখ, একই জিহ্বা, একই কান ও উপলক্ষ্য হবে।

দশজন বন্ধু যখন একই সাথে কোনো বাগান বা দোকান ভাগাভাগি করে বা তার অংশীদার হয়, তখন তারা এক হয়ে কথা বলে, এক হয়েই পরিকল্পনা করে, আর একযোগে কাজ করে; কেননা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। অতএব, পুনরুত্থান দিবসেও যেহেতু তাদের বিষয়গুলো হবে খোদাতাঁ'লার সাথে, সেহেতু তারা হবে এক।

এই দুনিয়ায় একেকজন একেক বিষয় নিয়ে মঞ্চ। কেউ নারীর প্রেমে বিভোর, কেউ বা সম্পদের, আবার কেউ জমি-সম্পত্তি সংগ্রহের চিন্তায়; আর কেউ জানার্জনে রয়েছে ব্যস্ত। সবাই বিশ্বাস করে যে তাদের আরোগ্য, তাদের আনন্দ-বিনোদন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব ওই একটি বিষয়ের মাঝেই পাওয়া যাবে।

আর তা হচ্ছে খোদায়ী তথা ঐশ্বী করুণা, কারণ তারা যখন খোঁজ করে তখন (তা) পায় না;

আর তাই তারা কিনে আসে। কিছুকাল অপেক্ষার পরে তারা আবার আসে। কিছুকাল অপেক্ষার পরে তারা কালাশ, “ওই খুশি ও আনন্দ তালাশ করা দরকার।

হ্যাতো আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিন। অতএব, আমি আবার খুঁজে দেখবো।” অতঃপর তারা আবার এর সন্ধান করে, কিন্তু তবু তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দেখা পায় না।

এমতাবস্থায় তারা তালাশ করতেই থাকে, যতোক্ষণ না হক্ক (সত্য তথা খোদাতাঁ'লা)-এর নিজস্ব পর্দা ওঠাবার সময় উপস্থিত হয়। অতঃপর তারা (ভেদ) জানতে পারে।

কিন্তু খোদাতাঁ'লার এমন কিছু বান্দা আছেন, যাঁরা পুনরুত্থানের আগেই বিষয়টি জানেন। হ্যারত আলী কারারামাজ্জাহ ওয়াজাজহু (মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালালামের চাচাতো ভাই ও তাঁর মেয়ের জামাতা) বলেন,

“পর্দা ওঠানো হলেও আমার ইমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি পাবে না।” এর মানে হলো, “দেহত্যাগ ও পুনরুত্থান হলেও আমার এয়াকিন (নিশ্চিত বিশ্বাস) আর বাঢ়বে না।”

(চলবে)



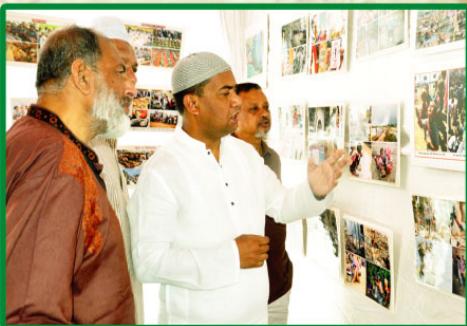
SZHM Trust নিয়ন্ত্রণাধীন 'যাকাত তহবিল'-এর 'নারী উন্নয়ন কর্মসূচি'র অধীনে 'সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' উদ্বোধন করছেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদ সভাপতি আলহাজু রেজাউল আলী জিসিম চৌধুরী।



SZHM Trust নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলা সংগঠন 'আলোর পথে' আয়োজিত 'পৰিত্ব মিরাজ-উন্নবী (দণ্ড) ও আউলিয়া-ই কিরামের শিক্ষা' শৈর্ষিক মাসিক মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন মাওলানা কাজী মোহাম্মদ হাবীবুল হোসাইন।



'সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ দাতব্য চিকিৎসালয়'-এ 'লায়স ক্লিনিক' অব চিটাগঙ্গ মেট্রোপলিটন'র সহযোগিতায় চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান অনুষ্ঠান।



SZHM Trust -এর উদ্যোগে জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে 'ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বলিত দুর্লভ চিত্র এবং ভিত্তি ও প্রদর্শনী' উদ্বোধন শেষে প্রদর্শনী দেখছেন চসিক বাগমনিরাম ওয়ার্ক কাউন্সিলর মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন।



শাহানশাহ বাবাজানের প্রধান খলিফা সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ স্মরণে নগরীর বিবিরহাটে 'যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্ষদ' প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করছেন চসিক দ্বিতীয় পঞ্চম ঘোলশহর ওয়ার্ক কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ মোবারক আলী।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন' আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে শিক্ষার্থী।

THE MONTHLY ALOKDHARA

REGD. NO CHA-272

PRICE : 15.00



শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমূখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

- মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
- উস্মাল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
- গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইনসিটিউট (দাখিল), পশ্চিম গোদাবী ৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
- শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) স্কুল, শাস্ত্রবৰ্ষীপ, গাহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
- মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
- শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ইসলামি একাডেমি, হাইদেগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
- শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া ও নূরানী মাদ্রাসা, সুন্মাবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
- বিশ্বাসি শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) হাফেজিয়া সুন্মায় মাদ্রাসা, হাটপুরুরিয়া, বটতলী বাজার, বুড়া, কুমিল্লা।
- মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) হিফ্যখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী।
- জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
- মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
- মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
- শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
- মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী, বৈদেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
- শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
- মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
- জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চৰিজিরপুর (চ্যারিমুড়), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
- শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৯. জিয়াউল কুরআন সুন্মায় ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, এয়াকবুদ্দীনী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২০. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।

২১. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়া হাট, ফরহাদবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২২. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চৰিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৩. শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই (রেললাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৪. মাইজভাণ্ডার শরিফ গণপাঠগার।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- শাহানশাহ হ্যারেট সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) বৃত্তি তহবিল

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প:

- হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।

দরিদ্র বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত তহবিল।
- দুষ্ট সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।
- আলোকধারা বুকস্ মাসিক আলোকধারা।

আয়োন্নয়নমূলক যুব সংগঠন : তাজকিয়া।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
- মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প:

- দৃষ্টিন্দন যাত্রীছাউলী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- দৃষ্টিন্দন যাত্রীছাউলী ও ইবাদাতখানা, নাজিরহাট তেমুহলী রাস্তার মাথা।
- দৃষ্টিন্দন যাত্রীছাউলী, শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে:

- ন্যায়যুল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ) আম্যমান ওয়খানা ও ট্যালেট।